ক্ষতবিক্ষত জীবন

== নাহার

ছাতার রঙের মতো আমার জীবন। রঙ বলতে একটি নির্দিষ্ট রঙকে বোঝাতে চেয়েছি। সেই রঙটি হলো কালো। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন এই কালোর মধ্য দিয়ে কাটছে। আমার বাবার বাড়ি এবং শ্বশুরবাড়ি একই জেলায়, থানা দুটি ভিন্ন।

রক্ষণশীল সৈয়দ পরিবারে আমার জন্ম। আমরা সাত বোন পাচ ভাই। আমার বড় তিনটি ভাই। রক্ষণশীল পরিবারের বাবা নামের পুরুষ এবং বড় ভাই নামের পুরুষ আমাকে যে কতোভাবে ক্ষতবিক্ষত করেছে তা কোনো ভাষা দিয়ে বলে বোঝানো যাবে না। বাবা, ভাই এবং স্বামী নামের এই পুরুষরা ফুটন্ত রঙ বেরঙের ছাতা হয়ে আমার পাশে দাড়াতে পারতো। কিন্তু না, সেই ফুটন্ত ছাতা না হয়ে কালো রঙের ছাতায় বাটের আঘাত হয়ে আমার জীবনকে করছে ক্ষতবিক্ষত।

এই সৈয়দ পরিবারের বড় ভাই নামের পুরুষটি সম্পর্কে সামান্য কিছু কথা বলতে চাই। সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করতাম। বাড়ির ভেতরের যতো কাজ আমি এবং বাইরের কাজ কাজের মেয়ে করতো। হঠাৎ একদিন ধান ঝাড়তে ঝাড়তে খুব খারাপ লাগছিল। এসে যখন বিছানাই শুয়ে পড়েছি তখন সেই প্রথম বড়ভাই নামের পুরুষটি বাবাকে ডেকে এনে দেখিয়ে বলছে, অতো শোয়া কিসের, আমার মনোবিজ্ঞান পড়া আছে, সব বুঝি সে শুয়ে শুয়ে কি ভাবে – এই বলে সে নানান রকম অশ্রাব্য মন্তব্য করলো। বাবা সেই কথা শুনে আমাকে যে কি মারা মারলেন তা লিখতে আমার দুই চোখ দিয়ে অঝোরে পানি পড়ছে। বলতে পারেন পাঠক পাঠিকারা, এখানে আমার অপরাধ কি ছিল? সেই থেকে আমার আর কোনোদিন দুপুরে শোয়া হয়নি। ভাই নামের পুরুষটি পড়তো কুষ্টিয়া কোয়াতুল ইসলাম আলিয়া মাদ্রাসায়।

সে যখন বাড়ি আসতো তখন মনে হতো যেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আসছে। এবং তাকে সেভাবেই অভ্যর্থনা দেয়া হতো। কতো শত রান্না যে করেছি! বিভিন্ন আইটেমের খাবার বাবা আর তাকে পরিবেশন করেছি। পাশে দাড়িয়ে আমি অথবা আমার ছোট বোনটি তাদের বাতাস করেছি। বলুন তো, চার পাচ বছরের বাচ্চার কি বাতাস দিতে হাতে ব্যথা হয় না? যদি একটু হাত অবশ হয়েছে তাহলে হাত থেকে পাখা কেড়ে নিয়ে বেদমভাবে মেরেছে আর বলেছে, *ভাতার বাড়ি* যাবি না। কাজ করা লাগবে না। ভাতারের বাতাস দেয়া লাগবে না। এসব অগণিত অশ্রাব্য কথা ছুড়ে মেরেছে। এভাবেই সে আমাদের জীবনকে পিষে মেরেছে। প্রতিটি কাজের মেয়ের সঙ্গে সে ব্যভিচারে লিপ্ত

থেকেছে। সে এতো জঘন্য, এতো ঘৃণ্য যে এরশাদ সিকদারও তার কাছে হার মানবে। কাজের মেয়েরা কোন সাহসে এই বহুরূপী এরশাদ সিকদারের কথা বলবে!

মেজভাই ছিল একটু ভিন্ন। সে ঢাকাতে ছোট একটা চাকরি করতো। আগে একটা বিয়ে করেছিল। কিন্তু আমার দাম্ভিক বাবা সেই বিয়েটা মেনে নেন না। পরে জোর করে আমার মামির মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন।। ভাই সেটা মেনে নিতে পারে না। আর মামাতো বোনটা আমাদের বাড়িতেই থেকে যায় এবং একটি ছেলে সন্তান হওয়ার পর মেজভাই চার পাচ বছর কোনো সম্পর্ক রাখেনি।

আমার সেজভাই নামের ঘৃণ্য পুরুষটি ভাবীকেও রেহাই দেয়নি। এবং তার সেই মাসুম বাচ্চাটিও তার শিকার হয়েছিল। এর কারণে ভাবী তার কথা মেনে নিতো। সেই বয়সে না বুঝলেও এখন বুঝি। ভাই নামের পুরুষটি বাচ্চাটিকে দুই পা ধরে থামের সঙ্গে মাথায় আঘাত করতো আর বাচ্চাটি চিৎকার দিয়ে কেদে অজ্ঞান হয়ে যেতো। এভাবে দিনের পর দিন আঘাত করার ফলে ছেলেটি এখন হাবাগোবা কালো হয়ে গেছে। তাকে আমিই লেখাপড়া করাতাম, সে লেখাপড়ায় ভালো ছিল। আজ আমার সেজভাইয়ের কারণেই ছেলেটির এই পরিণতি।

আমি বহু কষ্টে লেখাপড়া শিখেছি। ১৯৮৭-তে এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলাম। দুপুরে রান্না করছি। হঠাৎ এমন সময় আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে কাবিননামায় সই করতে বলে। আমার বাবা ছিলেন ম্যারেজ রেজিস্ট্রার। আমি দিশেহারা হয়ে পাগলের মতো কাদতে থাকলাম। এ আবার কোন জাহান্নামে আমাকে ঠেলে দিচ্ছে। আতঙ্কে বুক কেপে উঠেছিল। এটা আমার জীবনে সত্য হয়ে দেখা দিল। এক জাহান্নাম থেকে আরেক জাহান্নামে এসে পড়লাম।

আমার স্বামীর বয়স ছিল ৪৩ বছর। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে আমার জন্ম। তখন বাইরের জগৎ সম্বন্ধে কোনো জানা ছিল না। বাবার বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী অবস্থায় কাটিয়েছি, কোনো মানুষের সামনে যাইনি। তাই কারো কাছে শুনতেও পাইনি যে, আমি দেখতে কেমন। তবে স্বামীর বাড়িতে যে একবার আমাকে দেখেছে সেই আমার স্বামীকে বলেছে, তোর ভাগ্যটা খুব ভালো যে, এ রকম একটি লম্বা ফিগার, ভালো, মিষ্টি মেয়ে পেয়েছিস। কেউ আমাকে ভালো বললেও সে সহ্য করতে পারতো না। সে আমাকে অকারণে হাতের কাছে যা পেতো তাই-ই দিয়ে খুব মারধর করতো। এই মার আমার শাশুড়ি-ননদ-ভাসুর এবং প্রতিবেশীরা মেনে নিতে পারতেন না। তারা খুব রাগ করতেন। আমাকে তারা খুব ভালো জানতেন। আমি ছিলাম আমার ননদ-ভাসুরের ছেলেমেয়েদেরও ছোট। আমার থেকে গ্রামের ছোট মেয়েরা অনেক কিছু বুঝতো এবং আমাকে ইয়ার্কি মেরে অনেক কিছু

বলতো। তাদের কথা কিছুই বুঝতাম না। স্বামী কি জিনিস তাতো আমার জীবনে আসেনি। আমি বুঝবোই বা কি করে। স্বামী নামের সার্টিফিকেট আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে।

আমার শাশুড়ি এবং ননদ বলতেন, একটু রাগী, ওর কাছে কাছে থাকবে এবং যা বলে তা-ই শুনবে। সে সব সময় আমাকে এড়িয়ে চলতো। তবু আমার জীবন দিয়ে তার সমস্ত কাজ করে দিতাম। দিনে দিনে তার অত্যাচার আরো বাড়তে থাকে। একদিন মনে হলো টিভিতে, বইতে স্বামী-স্ত্রী কতো শত ভালোবাসার কথা বলে এবং ভালোবাসে। সে আমাকে নাইবা ভালোবাসলো! নাইবা চুমু দিল, আমি তাকে চুমু দেবো। তাহলে বোধহয় সে অফিস থেকে এসে আমাকে আর মারবে না। কিন্তু তার কাছে যাবো কি করে, সে তো তার কাছেই আমাকে যেতে দেয় না। তাই অফিসে যাবার সময় যখন চশমা, ঘড়ি, জামা-কাপড়, জুতা মুছে দিতে যাবো তখন চুমু দেবো মনে করে যেই না জড়িয়ে ধরে চুমু দিচ্ছি তখনি চুল টেনে ধরে দুই গালে দুটো চড় মেরেছিল। রাগে সামনের চুল উপড়ে দিয়েছিল। এতো জোরে চড় মেরেছিল যে, ১৫ দিন গালে দাগ ছিল। সেই থেকে পুরুষদের প্রতি আরো তীব্র থেকে তীব্রতর ঘৃণার সৃষ্টি হয়।

গণতন্ত্রের দেশে বাস করেও আমার জীবন একনায়কতন্ত্রের প্রভাবে বিকিয়ে গেছে। তাই খোদার কাছে আমার মিনতি, আমার মতো জীবন যেন বাংলার মাটিতে আর একটা না হয়। এ রকম বাবা, ভাই, স্বামী যেন কারো না হয়। এভাবেই আমার জীবন কেটে যাচ্ছিল।

প্রবাদে আছে *ঝিনুকে করে ঢেলে দিলেও নাকি হয়।* এভাবেই আমার জীবনে এসেছিল দুটি অপূর্ব সন্তান। যদি কেউ আমাকে বলে পৃথিবীতে সব চেয়ে সুন্দর এবং অমূল্য জিনিস কি? তাহলে বলবো, আমার দুটি সন্তান। আমার সন্তান দুটি আমাকে রঙ বেরঙের ফুটন্ত ছাতা হয়ে সব সময় আমাকে আগলে রাখে যেন খরা, বৃষ্টি, কালবৈশাখীর ঝড় আমাকে আঘাত করতে না পারে। এভাবে আমার সন্তান দুটি আমাকে আগলে রাখে। আল্লাহর কাছে আমার লাখ লাখ শোকর, আমাকে সে অমূল্য দুটি সন্তান দিয়েছে। খোদা যেন তাদের আয়ু বৃদ্ধি করে, অনেক বড় মাপের মানুষ এবং দুনিয়াতে, আখেরাতের সুখ দান করে।

তাই যাযাদির সম্পাদক ও সকল পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, আপনারা আমার সন্তান দুইটির জন্য দোয়া করবেন যেন আমার মতো মায়ের পাশে দাড়াতে পারে। এবং এই সমস্ত অত্যাচারী বাবা, ভাই ও স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

কুষ্টিয়া থেকে

রোমের পথে

-- এসএম জাকির হোসেন

প্রেগ আমরেল্লা কথাটার অর্থ করলে দাড়াবে - প্রেগ অর্থ *স্বাগতম* আর আমরেল্লা অর্থ *ছাতা।* ইটালিয়ান ভাষায় এর অর্থ হলো *স্বাগতম ছাতা।* সাধারণত ছাতা বিক্রি করার সময় এটা ইটালিয়ান ভাষায় কমন আহ্বানের ভাষা। ইটালিতে বসবাস করেন এমন বাংলাদেশি নেই যিনি এখানকার ছাতা বিক্রির কথা জানেন না।

আমরা বাংলাদেশিরা যারা এখানে অবৈধভাবে বসবাস করছি তাদের একটা বিরাট সংখ্যক রাস্তাঘাটে ব্যবসা বাণিজ্য করেন। কিন্তু বৃষ্টির দিনে তো আর ব্যবসা হয় না তাই এমন দিনে ছাতা বিক্রির হিড়িক পড়ে যায় রোমের পথে পথে। যারা এখানে নতুন এসেই ছাতা বিক্রি করবেন অথচ কোনো ভাষা জানেন না তারা *প্রেগ আমরেল্লা* কথাটি অতি দ্রুত শিখে নেন। তবে ছাতা বিক্রি অনেকের জন্য অস্বস্তিকরও বটে। একটা ঘটনা বলাই লেখার উদ্দেশ্য।

আমি ইওরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে ১৯৯৮-এর নভেম্বর ইটালিতে আসি সহজ শর্তে দেয়া ইমিগ্রেশন নেয়ার জন্য। বহু কষ্টে সমস্ত কাগজপত্র জমা দেয়ার পরও যখন দীর্ঘ সময় লাগছিল তখন আস্তে আস্তে হতাশ হয়ে যাচ্ছিলাম। কারণ জমানো টাকা প্রায় ফুরিয়ে আসছিল। এদিকে এখানে কাজ দেয়ার মতো আমার কেউ নেই। এমন সময় এক শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর পরামর্শে তার সঙ্গে ব্যবসা করা ধরলাম। কিন্তু আমি রাস্তায় ব্যবসা করে সুবিধা করতে পারছিলাম না। বন্ধু আমাকে বৃষ্টির দিনে ঘরে বসে না থেকে ছাতা বিক্রির পরামর্শ দিল। চক্ষু লজ্জার কারণে এই কাজটি করতে পারছিলাম না। কেননা ছাতা বিক্রিকে বাংলাদেশিরা খুব নিচে নামিয়ে এনেছিল যা ইটালিয়ানদের বিরক্ত করতো।

যখন আমার পিঠ প্রায় দেয়ালে ঠেকে গেল তখন টাকা কামাতে পারছি না। কাজ পাচ্ছি না, কাগজ পাচ্ছি না বৈধতার। তখন সব লাজলজ্জা ভুলে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এমনই সময় এক ঘোর বর্ষণমুখর দিনে ছাতা বিক্রিতে আমার অভিষেক ঘটে যেন ক্রিকেটের পিচে ব্যাট হাতে এ আমার অভিষেক। প্রথম দিনে কোনো বিক্রি নেই। বন্ধুর উৎসাহে তবুও পরের দিন আবার যাই। এরপর আস্তে আস্তে একটা দুটো করে বিক্রি শুরু হলো। অন্তত টাকা জমাতে না পারলেও কারো কাছে ছোট হতে হতো না। শুধু বৈধ পারমিটের অপেক্ষায় ছিলাম।

সময় মতো আবহাওয়ার খবর দেখা প্রায় একটা অভ্যাস হয়ে দাড়িয়ে গেল। কারণ এখানকার আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রায় ৯৫% মিলে যায়। আমরা জানতে পারি বৃষ্টির সঠিক সময় বা আদৌ হবে কি না।

ছাতা বিক্রি করতে গিয়ে একদিন আমার দেখা হয় দীপালির সঙ্গে। দীপালি কলকাতার মেয়ে। প্রথম দিন সে দশ মিলা দিয়ে আমার কাছ থেকে ছাতা কিনে নেয় আর জিজ্ঞাসা করে আমি বাংলাদেশি কি না। পরে আরেক দিন তার সঙ্গে দেখা একই জায়গায়। সেদিন তার সঙ্গে আমার কথা হয়। পাশের বাসস্টপে তার বাস আসতে তখনো দেরি ছিল। জায়গাটি ছিল মেট্রোর শেষ স্টপেজ *আনাঙ্গিনা।* এখান থেকে নানান জায়গায় বাস যেতো। তাকে এখান থেকে বাস ধরতে হতো। আমি কখনো বাসার কাছে ছাতা বিক্রি করতাম না। এখানে ছাতা বিক্রি করতে আমার খারাপ লাগতো। তাই দূরে যেতাম বিক্রি করতে।

তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমি সব সময়ই সেই স্থানেই যেতাম। সে প্রায় প্রতি বৃষ্টির দিনেই আমার কাছ থেকে ছাতা কিনে নিতো। কথা প্রসঙ্গে সে বলে, এখানকার ভারতীয় দূতাবাসে সে কর্মরত। অন্য আরেক ইনডিয়ান ফ্যামিলির সঙ্গে থাকে দীপালি। আমিও কখনো কখনো নিজের কথা বলেছি তাকে। আমি প্রতিদিন ছাতা কিনতে নিষেধ করতাম। কারণ আমার ধারণা আমাকে সে করুণা করছে, তাই আমার অপমান লাগতো। আমার সন্দেহ, ব্যাগের ভেতর ছাতা রেখেও সে ছাতা কিনতো। এ জন্য তাকে কেনা দামে দিতে চাইতাম। কিন্তু কখনোই সে কিনতো না কেনা দামে।

এরপর আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। সানডেগুলো আমরা রোম শহরে চষে বেড়িয়েছি। সারাদিনের টিকেট কেটে কখনো বাসের শেষ স্টপে যেতাম শুধু শুধু। কখনো টুরিস্ট প্লেসে কিংবা ভ্যাটিকান বা ন্যাশনাল মিউজিয়াম এমনি কতো জায়গায় আমরা একসঙ্গে বেড়িয়েছি। সে আমাকে ব্যবসা কিংবা ছাতা বিক্রি করতে নিষেধ করতো। বলতো কাজ করতে। কিন্তু কাজ কোথায় পাবো, কাগজ পেলে অবশ্যই কাজ করবো। অনেকবার আমার কাছ থেকে ছাতা কিনে সেই ছাতার নিচে দাড়িয়ে অনেকক্ষণ কথা বলতো। কখনো আবার একই ছাতার নিচে। এক বাসের পর আরেক বাস এরপর অন্য বাস তবুও দীপালি আমার সঙ্গে দাড়িয়ে থাকতো। শেষ বাসে করেও যেতে হতো কখনো কখনো।

১৯৯৯ সালের নভেম্বরে দীপালি কলকাতায় যায় দুই মাসের ছুটিতে। আমিও কাকতলীয়ভাবে সেই মাসেরই চার তারিখে পারমিট পেয়ে যাই। এরপর ঘটনা ঘটে দ্রুত। সব কাগজ তৈরি করে প্রায় ছয়শ কিলোমিটার দূরে ভিসেনসাতে চলে যাই। কাজ যোগাড় করে এখানেই থেকে যাই। কিন্তু দুই মাস পর তার টেলিফোনে ফোন করে আর সেই ফ্যামিলিকে পাইনি। হয়তো নাম্বার বদল হয়ে থাকতে পারে বা বাসা বদল করতে পারে। কিন্তু আমি আগের নাম্বারে বহুবার খোজ করেছি।

২০০০ সালের সামারের (আগস্টে) ছুটিতে রোমের ভারতীয় দূতাবাসে গিয়েও কোনো খবর বের করতে পারি না। এরপর দুইদিন সেই পুরনো ছাতা বিক্রির স্থানে দাড়িয়ে থেকেও তাকে পাইনি। দীপালি হারিয়ে যায়। এখনো বৃষ্টির সময় তাকে আমার মনে পড়ে। মনে হয় কোথাও বৃষ্টিতে সে হয়তো আমাকে মনে করে। দীপালির সঙ্গে আমার কি শুধুই বন্ধুত্ব ছিল, নাকি আরো বেশি কিছু।

জানি এই লেখা দীপালি হয়তো পাবে না। তবু বলবো, তুমি জেনো, এখন আমাকে ছাতা বিক্রি করতে হয় না। তবে এক বৃষ্টির দিনে ছাতা বিক্রি করতে করতে তোমার সঙ্গে যে দেখা হয়েছিল এই সত্য মুছে ফেলার নয়।

ভিসেনসা, ইটালি থেকে

ভাদ্র মাসে

-- মোহাম্মদ সেলিম উদ্দীন

খুব ছোটবেলার কথা। তখন ক্লাস থৃ কি ফোরে পড়ি। এই সময়ে কয়েকদিন পর পর মুষলধারে বৃষ্টি হতো। তখন আমাদের বাড়িতে দুটি ছাতা থাকা সত্ত্বেও আমাকে ভিজে ভিজে স্কুলে যেতে হতো। কারণ একটি ছাতা নিয়ে যেতেন আমার হাই স্কুলে পড়ুয়া বড়ভাই আরেকটি আব্বা নিয়ে যেতেন অফিসে। এভাবে কয়েকদিন ভিজে স্কুল যাওয়ার পর বায়না ধরলাম, আমাকে ছাতা কিনে না দিলে স্কুলে আর যাবো না।

আব্বা রাজি হলেন। বললেন, এ সপ্তাহ কষ্ট করো আগামী সপ্তাহে ছাতা কিনে দেবো। পরের সপ্তাহে মহা আনন্দে বাজারে গেলাম ছাতা কিনতে। মনে খুশি আর ধরে না নতুন ছাতা নিয়ে স্কুলে যাবো এই ভেবে। নতুন ছাতা কিনে এনে রাতে পাশে নিয়ে ঘুমালাম। পরদিন সকালে দেখি আকাশ পরিষ্কার, সূর্য হাসছে।

নিমেষেই আমার আনন্দ করার আয়োজন ফুরিয়ে গেল। তবুও ছাতা সঙ্গে নিয়ে গেলাম এই ভেবে যদি বৃষ্টি আসে। এভাবে পর পর বেশ কয়েকদিন বৃষ্টির নাম-গন্ধ পেলাম না। তবুও ছাতা স্কুলে নিয়ে যেতে থাকলাম।

এর মধ্যে একদিন একলোক আমার ছাতা দেখে পথিমধ্যে বললেন তুমি নতুন ছাতা কিনেছো । কিন্তু এখন তো আর বৃষ্টি হবে না।

স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

তিনি বললেন, এটা ভাদ্র মাস। বৃষ্টি হয় আষাঢ়–শ্রাবণ মাসে। এখন থেকে আষাঢ়–শ্রাবণ মাস আসতে আরো এক বছর দেরি, এই এক বছর তোমার ছাতা কোনো কাজে লাগবে না। তুমি বরং ছাতাটা আমার কাছে বিক্রি করে দাও। আবার যখন বৃষ্টির সময় আসবে তখন তোমার কাছে বিক্রি করে দেবো। চলো চকলেট কিনে দিই, বলে তিনি আমাকে দুটি চকলেট ও একটি আইসক্রিম কিনে দিলেন এবং হাতে দুটি টাকা দিয়ে ছাতাটা নিলেন।

আমি যেন কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না। বাকরুদ্ধ হয়ে শুধু তাকিয়ে রইলাম।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

পরিত্যক্ত

জিনী

ভর দুপুরে আধঘণ্টা দাড়িয়ে থেকেও যখন বাসের দেখা পেলাম না তখন ইচ্ছা হচ্ছিল বিআরটিসি–র বাসগুলো সব লাথি মেরে ভেঙে ফেলি। মনে মনে বাসগুলোর চোদ্দগুষ্ঠির মানইজ্জত উদ্ধার করে যখন সেই বাসেরই জন্য ইতি–উতি তাকাচ্ছি তখন হঠাৎ চোখ পড়লো পৃমিয়াম বাস কাউন্টার। সেখান থেকে একটা ছেলে এদিকেই তাকিয়ে আছে। খুব চেনাচেনা লাগছে। কিন্তু চিনতে পারছি না। চোখে চোখ পড়তেই ছেলেটি একটু হাসলো। বড় বোনের চোখ বাচিয়ে আমিও নিজের ঠোটে টেনে আনলাম হালকা সৌজন্যের হাসি। হঠাৎ হর্নের শব্দে চমক ভাঙলো। বাস এসেছে। ছেলেটির কপাল ভালো। তাকে দেখতে না দেখতেই বাস এসে গেল।

বাসের সিটে নিজেকে সমর্পণ করেই ভাবতে বসলাম, এই লাকি বয়কে আমি কবে, কোথায় যেন দেখেছি? স্মৃতির ফাইলগুলো নাড়াচাড়া করতেই বেরিয়ে এলো। স্মৃতির স্তূপ থেকে বেরিয়ে এলো এক বৃষ্টি ভেজা দিনের স্মৃতি।

তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ। আমার ষান্মাসিক পরীক্ষা চলছে। সেদিন ছিল আমার পদার্থ বিজ্ঞান পরীক্ষা। সারা বছর ফাকি দেয়ার ফলে স্বরচিত পদার্থ বিজ্ঞানের সূত্র খাতায় লিখে দিয়ে ভগ্নহৃদয় নিয়ে স্কুল থেকে যখন বের হলাম তখন টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। কিছুদূর যেতে না যেতেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। আশপাশে একটা রিকশাও পেলাম না। বৃষ্টিকে চূড়ান্ত অভিশাপ দিতে দিতে কলোনির একটা বিল্ডিংয়ের সিড়িতে আশ্রয় নিলাম। হঠাৎ দেখি একটা ছেলে দৌড়াতে দৌড়াতে এদিকেই আসছে। হাতে ছোট বড় কয়েকটা ব্যাগ এবং দারুণ সুন্দর একটা ছাতা। ছেলেটা আমার দিকে ছোট্ট একটা ব্যাগ এগিয়ে দিয়ে হাপাতে হাপাতে বললো, ব্যাগটা একটু ধরবেন প্লিজ!

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্যাগটা নিয়ে দাড়িয়ে রইলাম। ছেলেটি ততোক্ষণে বাকি জিনিসগুলো মেঝেতে রেখে ভেজা কাপড় ঝাড়তে শুরু করেছে। বুঝলাম না। ছাতা থাকতে ছেলেটা এতো ভিজলো কি করে?

কিছুক্ষণ পর ছেলেটি বললো, আপনি কোথায় যাবেন?

লালবাগ।

ও আচ্ছা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাড়িয়ে থাকার পর বললাম, আপনার ব্যাগটা ধরুন।

আপনার কাছে কলম হবে? আর একটু কাগজ?

কি প্রশ্নের কি জবাব! একবার ছেলেটির দিকে অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করে কাগজ কলাম এগিয়ে দিলাম। সেগুলো নিয়ে তরতর করে সে উপরে চলে গেল। আমি তো হতবাক। এ আবার কি?

ছেলেটি নেমে এলো কিছুক্ষণ পরই। হাসি মুখে বললো, এক মিনিট।

এরপর আমাকে কিছু না বলেই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেল। ছাতাও নিল না। মিনিট পাচেক পর দেখি, একটা রিকশা নিয়ে এসেছে।

যান, উঠুন।

মানে?

আপনার জন্য রিকশা ঠিক করেছি, যান।

আপনি আমার ঠিকানা জানেন?

আপনার সব জানি। আপনিও জানবেন। এখন রিকশায় উঠুন। আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

খুব অবাক হলাম। কিন্তু কিছু না বলে রিকশায় উঠলাম। রিকশা চলতে শুরু করেছে। এমন সময় দেখি, ছেলেটির ছাতা আর ছোট্ট ব্যাগটা আমার পায়ের কাছে। আশ্চর্য তো। এসব কি ছেলেটা ইচ্ছা করে দিয়ে গেল নাকি?

ব্যাগটা তুললাম। ভেতরে একটা বড় কার্ড। ছোট্ট একটা চিরকুট এবং একটা চিঠি। কার্ডের ওপর লেখা, For someone very special, very special.

আমি আবার very special হলাম কবে? ছেলেটা পাগল নাকি?

চিরকুটটা পড়লাম। তাতে লেখা :

তাড়াহুড়ো করে লিখছি। পাঠোদ্ধার করতে একটু কষ্ট হবে। সে জন্য সরি। এসব দেয়ার জন্য সেই স্কুল থেকে আপনার পিছু পিছু ঘুরছি। খোদা যে এমনভাবে সুযোগ মিলিয়ে দেবে তা ভাবিনি। আপনি কি খুব অবাক হচ্ছেন? ভাববেন না, চিঠিটা পড়লেই সব সংশয় কেটে যাবে।

ইতি আমি।

চিঠিটা খুললাম।

প্রিয় জিনী

আপনি আমাকে চেনেন না। কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। অনেক দিন আগে থেকেই চিনি। আর আপনাকে দেখার পর থেকেই মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। কিন্তু আপনার রগচটা স্বভাবের কথা জানি বলেই কথাটা বলার সাহস পাচ্ছিলাম না। এ নিয়ে বহুদিন থেকেই অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছি। এরই মধ্যে একদিন জানলাম, আপনি একজনকে ভালোবাসেন। সেদিন তার সঙ্গে আপনাকে দেখলাম। আপনাদের জুটিটা খুব মানিয়েছে।

এ পর্যন্ত পড়ে মনে করতে চেষ্টা করলাম কবে কোন ছেলের সঙ্গে আমাকে দেখলো? মনে পড়লো। এই তো সেদিন বান্ধবীর ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে গল্প করলাম। আর তাই দেখে এ বেচারা**...**।

আবার চিঠি পড়ায় মন দিলাম।

...*আপনি হয়তো খুব বিরক্ত হচ্ছেন। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই হচ্ছেন। ভাবছেন, সব কিছু জেনেশুনে এ চিঠি দেয়ার অর্থ কি? না, কোনো অর্থ হয়তো নেই। তারপরও মনে হলো, আমার একচেটিয়া ভালোবাসার কথা আপনার জানা উচিত। নিজের অজান্তেই ভালোবাসার মতো দুলর্ভ একট বস্তু আপনি অনায়াসে লাভ করছেন এটা জানার অধিকার আপনার আছে। আপনাকে আমি সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারি না। তাই এই চিঠি।*

দোষটা আসলে আমারই। আমার নীল পদ্মগুলো এমন একজনকে দিয়েছি যার ডালি অনেক আগেই পূর্ণ হয়ে আছে। যাকগে, ভালোবেসে মনে স্থান না-ই বা দিলেন, হৃদয়ের ঘৃণার আসনটাই না হয় আমাকে দিন। তবুও তো জানবো, আমি আপনার হৃদয়ে আছি। ঘৃণাভরে হলেও আপনি আমাকে স্মরণ করছেন।

ইতি

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী

মিলন

পুনশ্চ **:** উপহারগুলো দয়া করে ফেলে দেবেন না।

এই অনুরোধটি আমি রাখতে পারিনি। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে আমি। এসব জানাজানি হলে বাসায় তুলকালামকাণ্ড শুরু হবে। ছাতাটা রাস্তার এক পাশে ফেলে দিয়ে বাকি জিনিসগুলো ব্যাগে

ভরে বাড়ি ফিরলাম। ছেলেটির জন্য নাকি ছাতারটা জন্য জানি না, আমার চোখে পানি চলে এসেছিল।

আজ এতোদিন পরে তাকে দেখে ইচ্ছা হলো, বাস থেকে নেমে তার সঙ্গে কথা বলি। তাকে বলি...।

থাক, যা হওয়ার নয় তা ভেবে আর কি হবে? যা হারিয়ে গেছে তার জন্য দুঃখ করাটা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ ঘটনা। কিন্তু আজো সেই ছাতাটার জন্য আমার ভীষণ দুঃখ হয়। কালোর ওপর লাল ফুল আকা দারুণ সুন্দর সেই ছাতা।

ঢাকা থেকে

আশ্চর্য মিল

-- রাহাত

আমি সেদিন প্রথম এই পৃথিবীতে এসেছিলাম সেদিন নাকি বৃষ্টি ছিল।

আমার জীবনের প্রথম বোর্ড পরীক্ষার প্রথম দিনেও বৃষ্টি ছিল।

আমি যেদিন প্রথম কলেজে যাই সেদিন বৃষ্টি ছিল।

আমার জীবনে যেদিন প্রথম একটা ছেলেকে ভালো লেগেছিল সেদিনও বৃষ্টি ছিল।

যেদিন সেই ছেলেটাকে আমার জীবনের প্রথম ও শেষ প্রেম নিবেদন করেছিলাম এবং সে আমার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেছিল সেদিনও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল।

অর্থাৎ সেদিনও ছাতার দরকার হয়েছিল।

ময়মনসিংহ থেকে

দুষ্প্রাপ্য

-- এফ. এ মামুন

কুয়াকাটা আমার বাড়ি থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার দক্ষিণে। আমি যখন স্কুলের ছাত্র ছিলাম তখন এ অঞ্চলের মানুষজন শুধু শিক্ষা-দীক্ষাকেই নয়, বরং অবকাঠামোগত দিক দিয়েও এ অঞ্চলটি ছিল এবং বলতে গেলে এখনো অনেকই অনুন্নত। যাই হোক, ছাতার প্রসঙ্গে ফিরে যাই। আমার বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব ছিল দুই মাইল। আর পাকা রাস্তা খুজতে এখনো চার পাচ মাইল দূরে যেতে হবে। সুতরাং তখনকার অবস্থা তো সহজেই অনুমেয়।

আমার জন্ম এমনই এক পরিবারে যেখানে জন্মের পর স্কুলে ভর্তি হয়েই বুঝলাম একটা সাধারণ কালো রঙের ছাতাও কারো কারো স্বপ্নের বিষয় হতে পারে। উপরন্তু এই কল্পনাটুকুও ছিল অনেক উচ্চাভিলাষী লোকের দুঃসাহসের সমান। কারণ আমার বাবা ছিলেন গরিব। আর এটাই ছিল আমার সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের তথাকথিত বড়লোক আত্মীয়স্বজনের কাছে ছিলাম অপরিচিত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমার মা-বাবা ছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। আমাদের লেখাপড়া শেখাবেনই। আমাদেরও সব ভাইবোনেরই মেধা ছিল অসাধারণ। সঙ্গে বাবা মায়ের শাসন মিলে খেলাপড়া ভালোই চলতে লাগলো।

বর্ষার দিনে আমাদেরকে দুই মাইল হাটু সমান কাদা রাস্তা পেরিয়ে যেতে হতো স্কুলে এবং অবশ্যই ছাতাবিহীন। কারণ উপোস থেকে ছাতা মাথায় বিদ্যা শিক্ষার চেয়ে বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি এসে ভাত খাওয়ার সম্ভাবনাকেই মন বেশি সায় দিতো। তালপাতা বা বড় কচুপাতা হাতে ধরিয়ে মা বসে থাকতেন ভাঙা দরজার একপাশে এক দৃষ্টিতে আমাদের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে। যে দৃষ্টির অর্থ তখন বুঝিনি। আজ বুঝি। আবার গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদে ঘেমে গিয়ে বাড়ি ফিরে কতো দিন মায়ের সঙ্গে অকারণ রেগেছি তার ইয়ত্তা নেই। অবশ্য ছাতার প্রয়োজনীয়তা কখনো মুখ ফুটে বলাই হয়নি। কারণ কখনো কখনো দেখতাম বাবা প্রচণ্ড রোদে মাটি খুড়ে কোনো প্রাগৈতিহাসিক কালের গাছের গুড়ি তুলছেন। চেলা কাঠ বানিয়ে বাজারে নিয়ে যাচ্ছেন যা বিক্রির পরে চাল ডাল আসতো। সুতরাং এমন সংসারে ছাতা কেনার মতো বিলাসিতা করার সাহস লাগে যা অর্থ ছাড়া কখনোই সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে বাবা তার ভাঙাচোরা ছাতাটি নিয়ে যেতে বলতেন। কিন্তু সহপাঠীর ভর্ৎসনার ভয়ে আর তা নেয়া হতো না। আশ্চর্য! এতো ভেজার পরেও কখনো বৃষ্টিতে ভেজাজনিত কোনো অসুখই করতো না। কে জানে অসুখও বোধহয় তখন আমাদের আত্মীয়দের দলে যোগ দিয়েছিল।

আজ আমরা সবাই শিক্ষিত। বাবা মা ছাড়া প্রায় সবাই-ই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজ নিজ পেশায় নিয়োজিত। আমি সরকারি জগন্নাথ কলেজে ইংরেজি থার্ড ইয়ারে পড়ছি। আজ আমরা বিত্তশালী না হলেও অন্তত একটা দুটো শাদামাটা কালো রঙের নকশাবিহীন ছাতার জন্যে কষ্ট করতে হয় না। এখন বর্ষাকাল। বর্ষা দেখলে এখনো আমার বাবা মায়ের সেই অনুতাপমাখা শূন্য দৃষ্টি আমার চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার এখনো একটা ছাতা নেই। নেই মানে অভাবের জন্য নয়, আলস্যের কারণে কেনা হয় না। এরপরও মনে মনে জানি যে একটা ছাতা কেনা আমার জন্য কোনোই কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়।

বহুদিন বাবা মাকে দেখি না। কিন্তু *ছাতা* শিরোনামে লেখা আহ্বান দেখে আমার সেই পুরনো কষ্টের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে বাবা মায়ের কাছে কৃতজ্ঞতাটুকুও পৌছানোর একটা উপায় পেলাম। কারণ তাদের কাছে গেলে এসব কিছুই আর বলা হয় না। ক্ষমা করো বাবা–মা। না দিতে পারার যে যন্ত্রণা তোমরা সহ্য করেছো আমাদেরই জন্য তার কিছুই এখনো আমি শোধ করতে পারলাম না। আদৌ এ জীবনে সেই সৌভাগ্য হবে কি না তাও জানি না।

সিদ্ধেশ্বরী লেন, ঢাকা থেকে

রাবণ

অনামিকা

আওয়ামী সরকারের আমলের একটি দিন।

এই ছাতা সারাই করাবে–ন ছাতা...

এই যে ছাতাওয়ালা, এদিকে এসো। ডাকলেন রফিক সাহেব। এরপর স্ত্রীকে বললেন, রিনা, ছাতাটা নিয়ে এসে তো।

আচ্ছা এই ছাতাটি কি তোমার প্রাণপাখি। তুমি কি ছাতাটির মায়া ত্যাগ করতে পারছো না বলতে বলতে রিনা ছাতাটি নিয়ে এলো। বলি, একটা নতুন ছাতা কিনতে কি হয়। সংসারের প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় কতো জিনিসই তো কেনা হয়। এই রঙচটা, জং ধরা, শিক ভাঙা ছাতাটা বাদ দিয়ে একটা নতুন ছাতা কিনতে পারো না?

ঘরের দোরগোড়ায় উপস্থিত ছাতামেকার রিনার কথা শুনে বলে উঠলো, আপা কি বলেন, ছাতাটি তো এখনো পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়নি। নতুন ছাতা না কিনে এইটা মেরামত করলে স্যারেরও কিছু টাকা বাচবে, আমারও কিছু রোজগার হবে।

মুখে স্বামীর আর মনে মনে ছাতাওয়ালার চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করতে করতে রিনা নিজের কাজে চলে গেল।

সারা বছরে একমাত্র বৃষ্টির সময় ছাড়া তেমন ছাতা ব্যবহার করা হয় না বলে রফিক সাহেব নতুন ছাতা কেনার তাগিদ অনুভব করেন না। ছাতামেকারের সঙ্গে টুকটাক আলাপচারিতার মধ্যে রফিক সাহেব জানতে চাইলেন, তো বাপু, তোমার বাড়ি কোথায়?

স্যার, গোপালগঞ্জ।

তোমাদের বাড়ি কি শেখ হাসিনা আপামণিদের বাড়ির কাছে?

ছাতাওয়ালার মুখে বিশ্ব ভাণ্ডারের সমগ্র হাসি এসে ভর করেছে।

জি ভাই, ওনাদের বাড়ি থেকে বেশি দূরে না।

তার সম্বোধন স্যার থেকে ভাই-এ এসে ঠেকেছে। ভাই, তাহলে তো আপনি আমার নিজের লোক। আপনার কথা শুনে মনে বড়ই শান্তি পেলাম। আপনি শেখ হাসিনাকে *আপামণি* বলেছেন শুনেই বুঝতে পেরেছি আপনি আওয়ামী লীগ করেন।

রফিক সাহেব মনে মনে বললো, তুমি বুঝতে পেরেছো ঘোড়ার আন্ডা।

তা তোমার সরকার দেশের কেমন উন্নয়ন করছে? জানতে চাইলেন রফিক সাহেব।

খুব ভালো। দেখেন না ফসল কতো ভালো হচ্ছে। তবে খুন-খারাবি বেড়ে গিয়েছে। খুন-খারাবি করে তো সব বিএনপি। সরকারের যাতে দুর্নাম হয় এ জন্য এরা দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে।

রফিক সাহেব জানতে চাইলেন তুমি এই ছাতা সারানোর কাজ করো কতো বছর ধরে?

তা প্রায় বারো বছর।

তোমার সংসারের অবস্থা কি আগের থেকে ভালো হয়েছে?

না ভাই, একই রকম। সংসার চালাতে হিমশিম খাওয়া লাগে।

তাহলে তো আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে তোমার কোনো লাভ হয়নি।

রফিক সাহেবের মনে হলো এই কথাটি ছাতাওয়ালা ঠিক মতো শুনতে বা বুঝতে পারেনি। তাহলে নির্ঘাত রেগে যেতো।

কাজ শেষ হলে ছাতাওয়ালার পাওনা টাকা রফিক সাহেব বুঝিয়ে দিতে গেলে লোকটি বললো, আমার তো আপনার কাছ থেকে টাকা নেয়া উচিত না। আপনি আওয়ামী লীগ করেন, আমিও করি। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকলে কখনোই আপনার কাছ থেকে টাকা নিতাম না।

লোকটি চলে গেলে রফিক সাহেব ভাবতে লাগলো, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি সাধারণ মানুষের কতো ভালোবাসা। এই ভালোবাসার বিনিময়ে *যে লঙ্কায় গিয়েছে সে-ই রাবণ হয়েছে।* সাধারণ মানুষের ভালোবাসা শোষণ করে এই আসুরিক শক্তিগুলো চালিয়েছে দানবীয় তাণ্ডব।

খুলনা থেকে

অভিশপ্ত সময়

-- জাকির হোসেন

বাবা-মা, দুই ভাই আর এক বোন নিয়ে আমাদের ছোট সুখী একটি পরিবার। ক্লাস ফাইভে পড়া অবস্থায় প্রায়ই বৃষ্টিতে সব ভিজে বাড়ি ফিরতাম স্কুল থেকে। তাই মা বাজার খরচ বাচিয়ে যে সঞ্চয়টুকু

গড়েছিলেন সেখান থেকে কিছু টাকা দিয়ে আমার জন্য একটি চমৎকার ছাতা কিনে দিয়েছিলেন। মাকে জড়িয়ে ধরে সে ছাতার নিচে দাড়িয়ে নিজেকে তখন মনে হয়েছিল পৃথিবীর একমাত্র নিরাপদ মানুষ আমি। আমাদের পরিবারের কাছে অভিশপ্ত সময়ের সাক্ষী হয়ে আছে আওয়ামী লীগ সরকারের গত পাচটি বছর।

আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিএনপির চার নেতার বিরুদ্ধে যেদিন কোনো এক পাওয়ার স্টেশনের থাম ফেলে দেয়ার ষড়যন্ত্রমূলক নাশকতার মিথ্যা অভিযোগ আনলো (পরে প্রমাণিত হয়েছে এ কাজ আওয়ামী লীগই করেছে) সেদিন রাতে আমাদের বাড়িতে ডাকাতি হলো। অন্য সব জিনিসের সঙ্গে বাবার কিছু জরুরি কাগজ আর সেই ছাতাটিও নিয়ে গেল। পরে বাসায় পুলিশ আসে। কালো কাপড়ে মুখ বাধা ডাকাতদের মধ্যে বাবা একজনকে চিনেছিলেন। সে ছিল স্থানীয় এক যুবলীগ নেতা। পুলিশের কাছে বাবা তার নামসহ কেস ফাইল করতে চাইলেও পুলিশ সেই নামটি বাদ দিয়ে কেস নেয়। এর কতোটুকু অগ্রগতি হয়েছে আজো জানি না। এই দুর্ঘটনার তিন মাসের মাথায় বাবা রিটায়ার করেন। কিন্তু ডাকাতি হয়ে যাওয়া কাগজগুলো না থাকায় অনেক জায়গায় ধরনা দিয়েও পেনশনের টাকা পাবার পথ করতে পারেননি আজো।

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে পড়া আমার একমাত্র বোন শিউলির যেদিন গায়ে হলুদ হয়ে যায় তার পরদিন দেশের সব পত্রিকার প্রধান খবর হয়ে আসে ছাত্রলীগ নেতা মানিকের জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির ছাত্রী ধর্ষণের সেঞ্চুরি উৎসবের সংবাদটি। ছেলে পক্ষ থেকে সেদিন সকাল নয়টায় পাশের বাড়িতে ফোন করে বাবা-মাকে ডেকে দুঃখ প্রকাশ করে ফোনে জানিয়ে দেয় আপু জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির ছাত্রী হবার কারণে এখানে ছেলেকে বিয়ে করাবেন না। আমরা সবাই মুষড়ে পড়ি।

প্রেশার বেড়ে মায়ের অবস্থার অবনতি হতে থাকলে ডাক্তারের পরামর্শে একটি বেবিট্যাকসিতে করে হাসপাতালে রওনা হয়ে বাংলা মোটরের বিশাল জ্যামে আটকে পড়ি। সরকারের কোনো এক মন্ত্রী যেন কোথায় যাবেন তাই দুপাশের সব গাড়ি চলাচল বন্ধ। বড় ভাইয়া, বাবা, ট্রাফিক সার্জেন্টকে সব বুঝিয়ে বললেও সে একটি গাড়িও ছাড়তে পারবেন না বলে মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে সরে যায়। পুরো ৩২ মিনিট আটকে রইলাম জ্যামে। জ্যাম ছাড়লে হাসপাতালের গেটে পৌছে যখন মাকে নামাবো তখন তিনটি শ্বাস টেনে বাবার ঘাড়ের উপর ঢলে পড়লেন। মায়ের মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী ভেবে আহাজারি করে আপু খুব বেশি কাদলো। সংজ্ঞাহীন হয়ে ক্লিনিকে ছিল দুদিন। তারপর থেকে ও যেন কেমন হয়ে গেল। খুব বেশি চুপ থাকে। কখনো বা একাই প্রচুর কথা বলে। সব এলোমেলো।

সচিবালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের ওপর সরকার যেদিন কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল ভাগ্য দোষেই কি না জানি না বাবা সেদিন তার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যান সচিবালয়ে। পুলিশ আর কুকুরের নৃশংস হামলা থেকে বাচতে গিয়ে পা ভেঙে ফেলে। বাবা এখন ক্রাচে ভর দিয়ে হাটেন। এমএ পাস করা বেকার বড় ভাইয়া এখন আওয়ামী লীগের অবৈধ অস্ত্রের চালান নিয়ে আসে সীমানার ওপার থেকে। (সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই রকম একটি খবরের সত্যতা এক সময় স্বীকার করেছিলেন) এ খবর জানার পর বাবা ভাইয়াকে বাসা থেকে বের করে দিয়েছে।

আমার টিউশনির টাকায় বাবা, বোন আমি এই তিনটি মানুষের জীবন চলে যাচ্ছে কোনো রকমে। কিছুদিন আগে এক রাতে বিকম ফাইনালের প্রস্তুতি পড়া পড়ছিলাম। ক্রাচে ভর দিয়ে এসে বাবার আমার খাটে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বসলেন। বললেন, কি হবে রাত জেগে এতো পড়ে। আওয়ামী লীগ তো দলীয় সব সন্ত্রাসীদের নকলের উৎসব করিয়ে সার্টিফিকেট দিয়ে বিভিন্ন কোটা, সুপারিশ, ঘুসের জোরে দেশের বড় বড় চেয়ারগুলোতে বসিয়ে দিয়েছে। মেরুদণ্ডহীন সন্ত্রাসীগুলো চালাবে এই দেশ। আর তোরা যারা নকল না করে কষ্ট করে সার্টিফিকেট পাচ্ছিস তোদের জন্য তো কোনো ব্যবস্থা নেই। উপরন্তু টিভিতে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে যারা চাকরি পাচ্ছে না তারা নকল করে পাস করছে। পেনশনের টাকা পেলেও না হয় ছোটখাটো একটা ব্যবসা শুরু করতে পারতিস। চারদিক সব অন্ধকার হয়ে আসছে কি যে হবে তোদের।

গত পাচ বছরে আমাদের সাজানো সংসার তছনছ হয়ে যাবার জন্য আওয়ামী লীগ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কতোটুকু অপরাধী জানি না। আজ জানি না আমার ভাইয়া কোথায়, শুধু জানি, কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না বিশাল ছাতার মতো আমাদের নিরাপদ আশ্রয়টুকু প্রিয় খুব প্রিয় মাকে।

খিলগাও, ঢাকা থেকে

দ্বিধা

-- নুরুন নাহার আলমগীর

যখন স্কুলে পড়ি তখন এক বর্ষায় আমার ছাতা ছিল না। আমার মা বলেন, ভাঙা ছাতাটা নিয়ে যা। ভাঙা ছাতা নিয়ে যেতে আমার দারুণ খারাপ লাগছিল। তারচেয়ে বৃষ্টিতে ভিজে স্কুলে যেতাম। মাঝে মাঝে বান্ধবীদের ছাতার নিচে অর্ধেক ভিজে বাড়িতে ফিরতাম। তারপরও ভাঙা ছাতাটা নিতাম না। বর্ষাকাল প্রায় শেষ। সেই সময় আমার বড়ভাই চট্টগ্রাম থেকে আমার জন্য একটি সুন্দর ও আকর্ষণীয়

ছাতা পাঠালেন। ছাতার জন্য অবশ্য আগেই আমার বায়না ছিল। কিন্তু বড়ভাইয়া লোক না পাওয়ায় ছাতাটা পাঠাতে দেরি করলেন।

তবে ছাতাটা পেয়ে খুবই আনন্দ বোধ করলাম এবং ইচ্ছা করছিল তখনই স্কুলে চলে যাই। কিন্তু সেদিন ছিল শুক্রবার। পরের দিন বৃষ্টির কোনো আশঙ্কা ছিল না। ছাতাটা নিয়ে স্কুলে গেলাম। যখন আমার বান্ধবী এবং স্যাররা ছাতাটা হাতে নিয়ে দেখলো তখন নিজেকে গর্বিত মনে হয়েছিল।

অনেক দিন পর ১৯৯৮ সালে বিএড পড়ি। একদিন ক্লাস শেষে তুমুল বৃষ্টি শুরু হলো। অনেকেই ছাতা নিয়ে এসেছিল। কিন্তু আমি ছাতা আনিনি। একে একে সবাই চলে গেল। আমি ছিলাম একা। চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। আমার কেমন যেন ভয় ও নিজেকে অসহায় মনে হলো। হঠাৎ আমার এক ক্লাসমেট যদিও সে ছিল পুরুষ, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমার সঙ্গে যাবেন?

আমি তখন তাকে রিকশা খুজে দিতে বলি। এমন জায়গাটায় রিকশা একবারে পাওয়াই যায় না। বড় কষ্ট করে একটা রিকশা জুটলো যদিও আমরা দুজনই একই পথের পথিক ছিলাম। তখন দুজনার মধ্যেই ইতস্তত, কি করা যায়। অনেক অপেক্ষা করলাম আরেকটা রিকশা মিললো না।

লোকটি বলার আগেই বললাম, চলুন, একই রিকশায় যাই। রিকশায় উঠে নানান রকম প্রশ্ন জাগলো আমার মনে যে, লোকটা কেমন? কোনো বিপদ হবে না তো? কেননা ১৫ দিন পরে একটা ক্লাস – কাউকে ভালোভাবে জানতাম না।

তাই মনটা রিকশায় বসে ভয়ে ভয়ে কাপছিল। এরই মধ্যে তার গন্তব্যস্থলে লোকটিকে নামিয়ে দিয়ে বললাম, আপনাকে ধন্যবাদ, আপনার ছাতাটা না হলে রিকশা করতে পারতাম না। এবং আমার বাসায় ফিরতে কষ্ট হতো। বাসায় ফিরে আমার সাহেবের কাছে সব খুলে বললাম।

তিনি আমাকে নিয়ে অনেক হাসিঠাট্টা করলেন, কোনো রাগ করলেন না।

ছাতা নিয়ে আমার আর এক ঘটনা। একটা হাই স্কুলে শিক্ষকতা করে বাসায় ফিরছিলাম। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হলো। রিকশার অপেক্ষা করে শেষে হাটতে শুরু করলাম। এরই মধ্যে দেখা হলো আমার বাসায় যে বৃদ্ধ লোকটি দুধ দেয় তার সঙ্গে। লোকটি বললেন, মা, বাসায় যাবেন।

বললাম, হ্যা।

বৃদ্ধ লোকটি আমার মাথায় ছাতা ধরে হাটতে লাগলেন।

কিন্তু তাতে আমি অস্বস্তি বোধ করলাম। বললাম, চাচা, আমার ছাতার দরকার নেই। এবং আমি আস্তে আস্তে তার কাছ থেকে সরে হাটছিলাম।

সরল মনের বৃদ্ধ গোয়ালা একেবারে নাছোড়বান্দা। তিনি কিছুতেই আমাকে বৃষ্টিতে ভিজতে দেবেন না। এ জন্য তিনি নিঃসঙ্কোচে, নির্দ্বিধায় আমার প্রতি সম্মান ও সরল ভালোবাসা দিয়ে তার মাথার ছাতা আমার মাথায় ধরে আমাকে বাসায় পৌঁছে দিলেন।

তার এই আচরণ আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটে আছে যা চিরদিন আমার মনে থাকবে।

বরিশাল থেকে

শৈশবে ভুল

—হালিমা খাতুন রিনি

আমার তখন বয়স আট বছর। আকাশটা ছিল খুবই মেঘলা। সকাল থেকে আকাশ মুখটা বেজায় ভার করেছিল ঠিক হাড়ির মতো কালো করে। এই বুঝি অঝোর ধারায় কান্না আরম্ভ করে দেবে।

বাবার চাকরির খাতিরে তখন আমরা চট্টগ্রামে থাকতাম। আমাদের বাসার সামনে একটি বিশাল পাহাড় ছিল। নিচ থেকে তাকালে মনে হতো, পাহাড়ের চূড়া থেকে আকাশ ছোয়া যাবে। যখন আকাশ থেকে অঝোর ধারায় বৃষ্টি শুরু হতো তখন আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠতাম বাধন ছাড়া পাখির মতো চঞ্চল চিত্তে ছোটাছুটি করে বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে।

ব্যস্ত মানুষের জন্য বৃষ্টি একটি বিরাট সমস্যা। বৃষ্টি আরম্ভ হলে ব্যস্ত মানুষের কাজে ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু বৃষ্টির দিনে সকল ঝামেলা থেকে মুক্তি দেয় ছাতা। বর্ষার অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎই সকালে ঝুমঝুম করে বর্ষণ আরম্ভ হলো। তখন এই চঞ্চল হৃদয় কিছুতেই ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে ইচ্ছুক নয়। সমস্যা হচ্ছে বাবাকে নিয়ে। বাবাকে আমরা চার ভাইবোন খুবই ভয় পেতাম। তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বৃষ্টিতে ভেজা হচ্ছে না। তাছাড়া বাবার অফিসে যাবার সময় হয়েছে। বাবা তখন অফিসে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আর অফিসে যাবার আগে বাবা যখন প্রস্তুত হতেন তখন আমরা সবাই চুপচাপ থাকতাম। বৃষ্টিতে ভিজতে না পেরে বাধ্য হয়ে সবাই পড়তে বসলাম। পড়তে পড়তে হঠাৎ বাবার চিৎকার শুনতে পাই। চিৎকার শুনে আমার অন্তর আত্মা কেপে ওঠে। ফ্যাল ফ্যাল করে ছোটভাইয়ার দিকে তাকিয়েছিলাম।

হন্তদন্ত হয়ে মা ছুটে আসেন আমাদের কাছে। কিছু বলার আগেই মা জিজ্ঞাসা করেন, এই, ছাতা নিয়েছে কে? কিছুটা শাসনের ঝাঝে জিজ্ঞাসা করেন, কি হলো, কথা কানে যাচ্ছে না, ছাতা কে কোথায় রেখেছে?

আমরা সবাই নিশ্চুপ। হঠাৎ মা বলে ওঠেন, মেজ কোথায়।

চমকে পেছন ফিরে দেখি মেজভাই নেই। পড়তে পড়তে কখন মেজভাই উঠে গেছে কেউ–ই সেটা খেয়াল করিনি। তখন আমাদের কারো বুঝতে বাকি রইলো না ছাতাটা কে নিয়েছে।

এদিকে বাবা তো রেগে আগুন। বাবার অফিসের সময় চলে যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত পরিবারে একটার বেশি ছাতা থাকে না। তাই আমাদের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম ছিল না। একটা ছাতা থাকায় বৃষ্টির দিনে আমাদের অনেক সমস্যায় পড়তে হতো। কিন্তু ছাতা না পেয়ে বাবার মেজাজ ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে গেছে।

অবশেষে আমি আর ছোটভাই বুদ্ধি করে লুকিয়ে মেজভাইকে খুজতে বের হয়ে পড়ি। বৃষ্টিতে ভিজে অনেক জায়গায় খুজলাম। কিন্তু মেজভাইকে কোথাও পাইনি। শেষে কোনো উপায় না পেয়ে বাসায় ফিরে এলাম। বাসায় ফিরে দেখি বাবা দরজা বন্ধ করে অগ্নিমুখে রাগান্বিত চোখে, হাতে ছাতা নিয়ে দাড়িয়ে আছেন। মেজভাইকে বৃষ্টির মধ্যে উঠানে দাড় করিয়ে রেখেছেন। বুঝতে বাকি রইলো না আমার আর ছোটভাইয়ার জন্য অপেক্ষা চলছে।

তারপর এক এক করে ছোটভাই, মেজভাই এবং আমাকে উঠানে বৃষ্টির মধ্যে দাড় করানো হলো। এরপর ছাতা নিয়ে পেটাতে আরম্ভ করলেন। পেটানো শেষ হলে আমাদের তিনজনকে বাড়ি থেকে বৃষ্টির মধ্যে বের করে দেয়া হলো। অবশ্য বড়ভাইয়া বড় হয়ে যাবার দরুন সেই ছাতার প্রহার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। মেজ এবং ছোটভাই রাগ করে কোথায় যেন চলে গেলেন।

বাবা রাগ করে সেদিন অফিসে যাননি। আমি আর কোথায় যাবো। ছাদে গিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে শুয়ে পড়লাম। আকাশের কান্না আর আমার কান্না সেদিন একাকার হয়ে গিয়েছিল। কাদতে কাদতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝতে পারিনি। ঘুম ভাঙলো বাবার ডাকে। আকাশ তখন আমার বাবার মনের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। সেখানে কোনো ভয়ঙ্কর কালো মেঘ জমে ছিল না। আমাকে কোলে করে বাবা ঘরে নিয়ে কাপড় পাল্টে খাইয়ে দেন। আমার রাগ তখনো যায়নি। বাবা আমার রাগ কমানোর জন্য অনেক আদর করেছিলেন।

বাবার অপ্রতুল স্নেহ আজো আমার হৃদয় থেকে সেই স্মৃতি মুছে দিতে পারেনি। আজো বাবা যখন বৃষ্টির দিনে বাইরে যাবার জন্য আমার কাছে ছাতা চান তখন আমার চোখে সেই ছাতা দিয়ে বেদম প্রহারের দৃশ্য ভেসে ওঠে। একজন বালকের শৈশবের সামান্য ভুলের জন্য সকলকে সেদিন শাস্তি পেতে হয়েছিল।

শৈশবের ছোটখাটো ভুলকে বড়দের ক্ষমার চোখে দেখা উচিত। সেদিন বৃষ্টির দিনের সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার জন্য মেজভাই বৃষ্টির মধ্যে ছাতা নিয়ে বের হয়েছিলেন। তার সেই কৌতূহলকে আমার

পিতা যে শাস্তি দিয়ে দমন করেছিলেন সেটা মোটেও ঠিক ছিল না। শৈশবের কৌতূহলকে এভাবে দমিয়ে দেয়া উচিত নয়। ছোটদের অনেক ভুলত্রুটি বড়দেরকে ক্ষমার চোখে দেখা উচিত। বড়দের ভালোবাসা ছোটদের একান্ত কাম্য।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

প্যারিসে

বছর পাচেক আগের কথা। স্বামীকে ব্যবসায়িক কাজে যেতে হয়েছিল প্যারিসে। সৌন্দর্যের নগরীকে এক নজর দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না। তাই আমি এবং আমার দুই কলেজ পড়ুয়া মেয়েও তার পিছু নিলাম।

স্বামী সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন ব্যবসার কাজে। তাই প্যারিসের কিছু দর্শনীয় স্থান নিজেরাই দেখার ব্যবস্থা করে নিলাম। প্যারিসের মেট্রো ব্যবস্থা খুবই অর্গানাইজড। একবার তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে সারা প্যারিস চষে বেড়ানো এমন কোনো কঠিন কাজ নয়। কিন্তু বাদ সাধলো প্যারিসের ঝিরঝিরে বৃষ্টি। বাধ্য হয়েই আক্রার দেশে কিনে ফেললাম তিনটি শস্তা ছাতা যদিও প্যারিসের প্রচণ্ড বাতাসে সেই ছাতাগুলো উল্টে যেতে চাইতো। এ অবস্থার জন্য চাই Wind proof ছাতা। যার দাম আমাদের নাগালের বাইরে।

যাই হোক। এ ছাতাগুলো দিয়েই কোনো মতে কাজ চালাতে লাগলাম। মেট্রোতে চড়ে বেশ কিছু বিশেষ স্থান দেখা শেষে আমরা এবার কিছু চিড়িয়াখানা দেখা মনস্থ করলাম। প্যারিসের সবচেয়ে বড় দুটো জুওলজিকাল গার্ডেন হলো *পোর্ট ডরি* এবং *পোর্ট জুসোতে।*

তারই একটা দেখতে আমরা মা, মেয়ে তিনজন বের হলাম একদিন। সঙ্গে ছাতা তিনটিও নিতে ভুললাম না। নানান ধরনের পশুপাখি এবং সীমাহীন সবুজের সমারোহ আমাদের চোখ ও মন ভরিয়ে দিল। অনেক হাটাহাটির পর ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম এক খাবার দোকানে। সারি সারি অনেক দোকান। তবে আমরা উপমহাদেশীয় চেহারার একজনের দোকানেই বসলাম। ভদ্রলোক শ্রীলঙ্কার। বেশ কিছু গল্পগুজবও হলো তার সঙ্গে। কয়দিন পরে একটু ইংরেজি বলতে পেরে হাফ ছেড়ে বাচলাম। খাওয়া সেরে পার্ক থেকে বের হওয়ার আগে আমরা টয়লেটের কাজ সারার জন্য গেটের কাছে টয়লেটে যাওয়ার মনস্থ করলাম। এক অদ্ভুত টয়লেট। অপ্রশস্ত লম্বা এক ডাক বাক্সের মতো। নির্দিষ্ট স্থানে পাচ ফ্রাঙ্ক দিলেই দরজা খুলে যায়। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার বন্ধ হয়ে যায়।

যাই হোক। টয়লেট সেরে পার্ক থেকে বের হওয়ার সময় দেখলাম ছাতা তিনটি নেই। বুঝলাম কি ঘটেছে। ছাতাগুলো ছিল আমার ছোটমেয়ের দায়িত্বে। সবার শেষে যে গিয়েছিল টয়লেটে এবং ছাতাগুলো সে টয়লেটের ভেতরেই ফেলে এসেছিল। কি করি! তাড়াতাড়ি পাচ ফ্রাঙ্ক বের করে আবার টয়লেটের দরজা খুললাম। কিন্তু না, ছাতার দেখা মিললো না। ভাবলাম যদি নির্দিষ্ট টয়লেটটা ঘুরে আবার আসে তাই তিন চারবার ফ্রাঙ্ক খরচ করলাম। তবে ছাতা তিনটি গায়েব। কিছুতেই মাথায় এলো না ছাতাগুলো কোথায় যেতে পারে।

এদিকে মেয়ে ভয়ে অস্থির বাবার বকা খাবে বলে। বাধ্য হয়েই গেটকিপারের কাছে ছাতার কথা বললাম এবং জানতে চাইলাম ছাতাগুলো কোথায় যেতে পারে। কিন্তু সে একটুও ইংরেজি বোঝে না বা বুঝেও না বোঝার ভান করলো। তাই নিরুপায় হয়ে সেই শ্রীলঙ্কার ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে অনুরোধ করলাম আমাদের ছাতাগুলো উদ্ধার করতে। তিনি ফরাশি ভাষায় সেই গেটকিপারকে জিজ্ঞাসা করার পরও কোনো তথ্য উদ্ধার করতে পারলেন না। অর্থাৎ ছাতা তিনটা সম্বন্ধে তারও কোনো ধারণা নেই।

সেদিন ছাতা হারানোর ব্যথা নিয়েই আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। ছাতা তিনটা যে কোথায় গেল তা আজো আমার কাছে রহস্যাবৃত রয়ে গেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

পরিণতি

—সাহিদ

ভালো ছাত্র এবং *ভালো ছেলে* – এ অপবাদ ছোটবেলা থেকেই মাথায় নিয়ে ঘুরতে হতো। অপবাদ বললাম এই জন্য যে, এটা আমার চারপাশে বাধা নিষেধের একটা বিরাট দেয়াল তৈরি করে রাখতো। বাটা কম্পানির মতো গুডউইল ধরে রাখতে গিয়ে নিজের ইচ্ছাগুলো অন্যের ইচ্ছার কাছে পরাজিত হতো। অবশ্য এর বিনিময়ে সবার কাছ থেকে পেতাম আলাদা একটা ভালোবাসা।

কিন্তু যেটা সে করতো তা ছিল বাড়াবাড়ি। সে হচ্ছে লুনা। আমার সাবেক কলেজমেট এবং বর্তমান...।

লুনা কেন যে আমাকে এতো ভালোবাসে তার কোনো কারণ খুজে পাই না। হয়তো বুঝে ফেলেছে, আমি আসলে একটি গাধা টাইপের ছেলে যাকে সারা জীবন আচলে বেধে ঘোরানো যাবে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এমন ছিলাম না। আমার আজকের এই পরিণতির জন্য দায়ী একটি ছাতা।

আমি তখন এইচএসসি–র ছাত্র। সবে দাড়ি কাটা শুরু করেছি। চোখে যেন রঙিন কন্টাক্ট লেন্স লেগে গেছে যা দেখি তাই–ই রঙিন লাগে, ভালো লাগে। গতানুতিক ধারা বজায় রাখতে তিন বন্ধু মিলে হাজির হলাম আনন্দ স্যারের দরজায় গণিতে বিদ্যাসাগর হওয়ার জন্য। অন্য সাবজেক্টের প্রাইভেট ও ক্লাসের সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে পড়লাম লুনাদের ব্যাচে। তারাও তিনজন।

ভালোই চলছিল সব কিছু। কিছুদিন পর বুঝতে পারলাম, ঘটনা *হ্যাজ বিন।* লুনা সব সময় যে কোনো উপায়ে আমার মুখোমুখি বসে। শুধু সারাক্ষণই আমার দিকে তাকানোর চেষ্টা করে। স্যার অংক বোঝাচ্ছেন। আর সে চেষ্টা করছে আমাকে বুঝতে।

কিন্তু ব্যাপারটা সবাই বুঝে গেল মাত্র কয়েকদিনের মাথায়। এবং শুরু হলো নানান রকম প্রবাদ, প্রবচনের প্র্যাকটিস। ইয়ার্কি, *ঠেস* মারা, বিখ্যাত কবি সাহিত্যিকদের উক্তি কোনোটাই বাদ নেই।

সেই সময়ে আমি যে কি করবো তা বুঝতাম না। এই যে ভালো ছেলের একটা আবরণ ছিল। প্রেম ভালোবাসা করা যাবে না, সবাই খারাপ বলবে, ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে ইত্যাদি কতো শত কারণ। অন্যদিকে প্রচণ্ড ইচ্ছায় বুক ফেটে যেতো।

যেন শ্যাম রাখি, না কূল রাখি অবস্থার মধ্যে পড়লাম। অবশেষে মহাশক্তিধর সেই ছাতাটির হাত ধরে আমার মুক্তি মিললো। এদিন স্যারের বাসায় ঢুকতেই আকাশ ভারী হয়ে এলো। পড়া শেষ হতেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। স্যারের বাসাটা বেশ নিরিবিলি একটা এলাকায়। রিকশা তো দূরের কথা, লোকজনই খুজে পাওয়া যায় না। কোনোমতে একটা রিকশা পাওয়া গেল।

লেডিস ফার্স্ট এই থিওরি মতে, রুনা আর সুমি রিকশায় উঠলো। লুনা বাদ। কারণ তার ছাতা আছে। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগেই বাসায় পৌছাতে হবে এই উদ্দেশ্যে রবিন ও অরুণ আগেই সাইকেল নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। বাদ থাকলাম আমি ও লুনা দুজন। ছাতা একটা।

লুনাকে বললাম, তুমি ছাতা নিয়ে চলে যাও, আমি পরে আসছি।

তার কথা হলো, অল্প বৃষ্টি হচ্ছে, এক ছাতায় দুজন যাওয়া যাবে।

চিন্তা করে দেখলাম, একটু এগিয়ে যদি রিকশা পাওয়া যায়! অবশেষে এক ছাতার নিচে দুজন চললাম।

ভারী আকাশ, সন্ধ্যা আর লোডশেডিংয়ের উপহার, প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ। নীরব রাস্তা, মেয়েলি শরীরের হালকা ছোয়া এবং গন্ধ। আমি যেন সেই হ্যামিলনের বাশিওয়ালা গল্পের বাচ্চা ছেলের মতো মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে হেটে চলছি, লুনাও হয়তো তাই।

হঠাৎ শুরু হলো প্রচণ্ড বৃষ্টি। ছোট ছাতা, দুজনেই প্রচণ্ডভাবে ভিজতে শুরু করলাম। উপায় না দেখে একটা গাছের নিচে দাড়ালাম। তাও ভিজছি। আমার হাতে ছাতা, লুনার কাধে ব্যাগ। হঠাৎ করে আমার শরীরের সঙ্গে সে লেগে দাড়ালো। দুই হাত দিয়ে আমার বাহু ধরে, মুখটা কাধে চেপে ধরলো। আমি যেন স্ট্যাচু অফ লিবার্টি–র মতো স্থির হয়ে গেলাম। শরীরের রক্তপ্রবাহ কয়েকগুণ বেড়ে গেল। প্রচণ্ড এক মাদকতায় আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এলো।

লুনা ভেজা গলায় বললো, আমি তোমাকে ছাড়া বাচবো না।

এবার আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। তার শরীরের স্পর্শ আমার কথা বলার শক্তি কেড়ে নিল। কি যেন বলতে গেলাম। কিন্তু গলার কাছে এসে দলা পাকিয়ে গেল। কিছুতেই কথা বের হচ্ছে না। মনে মনে একটা দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করলাম।

কতোক্ষণ কেটে গেছে জানি না। আধভেজা থেকে পুরো ভেজা হয়ে গেলাম। বললাম, বৃষ্টি থামবে না। চলো এভাবেই আগাই।

কিছুক্ষণ পর একটা রিকশা পেয়ে ছাতাটা আমার হাতে রেখেই লুনা উঠে গেল রিকশায়। সারা রাত ঘুমাতে পারলাম না। পরদিন কলেজে গিয়ে তাকে পেলাম না। অস্থিরতায় পুরো এক প্যাকেট সিগারেট শেষ করলাম।

ছাতা ফেরত দেয়ার কথা বলে রুনার কাছ থেকে লুনার বাসার ঠিকানা নিলাম। মনের সমস্ত সাহস এক করে এবং রবিন ও অরুণের কাছ থেকে ধার করা সাহস নিয়ে চললাম লুনাদের বাসায়।

দরজা খুললো লুনার ছোট বোন। শুনলাম রাত থেকে তার ভীষণ জ্বর। লুনার রুমে নিয়ে গেল আমাকে। কিছুক্ষণ পর একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

সে বললো তুমি আমার মাথায় একটু হাত রাখো। আমি ভালো হয়ে যাবো।

প্রচণ্ড সাহস নিয়ে তার কপাল স্পর্শ করলাম। এবং গতকাল তার শরীরের স্পর্শে যে সিদ্ধান্তটা নিতে শুরু করেছিলাম, সেই সিদ্ধান্ত নেয়াটা তাকে স্পর্শ করে আজ সম্পন্ন করলাম। তাকে আমার পেতেই হবে।চলে আসার সময় যখন ছাতাটা তার ছোট বোনের হাতে দিলাম তখন। সে বললো, আপুর এই পরিণতির জন্য তা হলে আপনিই দায়ী।

মনে মনে বললাম, তোমার আপুর পরিণতির জন্য আমিই দায়ী। আর আমাদের দুজনের পরিণতির জন্য এ ছাতাটাই দায়ী।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ময়মনসিংহ থেকে

ব্যতিক্রমী

--আল-মাহমুদ

আমার ছাত্রীর সঙ্গে তাদের বাসায় যাচ্ছিলাম। স্কুল থেকে সে ফিরছিল। পথে সাক্ষাৎ। সেদিন একটু দেরিতে স্কুলে ছুটি হওয়ায় সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্যক্রমে সাক্ষাৎ হয়েছিল। স্কুল থেকে বাসা বেশি দূর নয়। হেটে যেতে দশ বারো মিনিট লাগে। রাস্তার এক পাশ দিয়ে দুজনেই হেটে যাচ্ছিলাম। আমার হাটার গতিটা একটু বেশিই ছিল। কিন্তু তার গতিটা ততোটাই শ্লথ ছিল। তাই দূরত্বটা বাড়ছিল।

এতো জোরে হাটছেন কেন?

উত্তরে মাথার ওপরে রোদের কথা বললাম।

তৎক্ষণাৎ স্কুল ব্যাগ থেকে ছাতা বের করে আমাকে দিল। যদিও তিনটার দিকে তেমন প্রখর রোদ থাকে না তবুও ছাতাটা মেলে ধরলাম। আমার কাছে ঘেষে ছাতাটার হ্যান্ডলটা টেনে ধরে সে অকস্মাৎ তার ওষ্ঠাধর দিয়ে আমার ওষ্ঠাধরে একে দিল পৃথিবীর প্রথম আলপনা।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাকে মুক্ত করে দিল সে।

এবার আমার আগে সে হাটছিল।

আমি তো ভীত, স্তম্ভিত, সন্ত্রস্ত। চারদিকে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই। তারপরও মন থেকে ভয় যাচ্ছে না। পাশাপাশি অপূর্ব এক ভালোলাগার আবেশে পুলকিত হচ্ছিলাম। স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কাজটা কেন করলে?

রাস্তায় কোনো জবাব পাইনি। পড়ানোর শেষে একটা চিরকুট পেলাম। তাতে লেখা –

আপনিই তো একদিন বলেছিলেন,

ছাতার নিচে ছিল দুটি মাথা

বৃষ্টিতে তাদের ঠোটে হলো কথা।

বৃষ্টি ছিল না, রোদ তো ছিল! আর বলেছিলেন পৃথিবীর কেউ আপনার ঠোটে স্পর্শ দিতে সাহস পায়নি। আমি ব্যতিক্রমী। আমি স-ও-ব পারি।

ইতি S

উল্লেখ্য, একটি দৈনিক পত্রিকায় এই ছড়াটি পেয়েছিলাম এবং সুযোগ বুঝে তাকে বলেছিলাম। এমন প্র্যাকটিকাল প্রমাণ পাবো ভাবিনি।

ফেরার পথে সেই রাস্তায় এসে মনে হলো, রাস্তাটা আরো দীর্ঘ হলো না কেন? মুহূর্তটা এতো তাড়াতাড়ি শেষ হলো কেন? *সাভার, ঢাকা থেকে*

স্পর্ধিত ভালোবাসা

--কে জামান সাচ্চু

আমরা লাইফ সায়েন্স ফ্যাকাল্টির চতুর্থ তলার করিডোর থেকে দেখলাম ম্যাডাম বেশ ব্যস্ততার সঙ্গে হাটছেন অথচ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি অনেকক্ষণ ধরেই চলছে। ম্যাডাম এদিক-সেদিক কয়েকবার তাকালেন, সম্ভবত রিকশা খুজছেন। কিন্তু কোনো রিকশা নেই। তাকে হাটতে হচ্ছে, হয়তো গেটে রিকশা পেতে পারেন। আমরা শান্তকে বললাম, এটা সুযোগ, তুই তোর ছাতাটা নিয়ে দৌড় দে। ম্যাডামকে পৌছে দিয়ে আয়। দোস্ত, কথা বলার একটা চান্স পেয়ে যাবি, যা।

শান্ত ছাতা নিয়ে ছুটলো।

এ সেই ম্যাডাম, শায়লা আফরিন। ইংরেজি ডিসিপ্লিনে সদ্য আসা এই তরুণী টিচার এখন খুলনা ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের কাছে রীতিমতো হার্টথ্রব। একজোড়া উচু হিল ম্যাডামকে পাচ-এক থেকে পাচ-চার করেছে। সামনে গতি রেখে একটা বিশেষ ভঙ্গিমায় ছন্দে ছন্দে হেটে যাওয়া ম্যাডামকে দূর থেকেই চেনা যায়। পেছনের ঝুটিবাধা চুলগুলো তার হাটার সঙ্গে ছন্দ রেখে নেচে নেচে কখনো ক্লান্ত হয় না। ক্লান্ত হই না আমরাও যারা তাকে দেখি মুগ্ধ হয়ে। তার চলার পথে অসংখ্য ছাত্রের প্রতীক্ষা। একটু দেখা, একটু হৃদয় নাড়ানো, মশলা মাখা আলোচনা। তার ভক্ত ছাত্রদের মধ্যে শীর্ষে আছে আমাদের বন্ধু শান্ত। ম্যাডামকে ইংরেজির বাইরে অনেক ডিসিপ্লিনে সাপোর্টিং সাবজেক্ট হিসেবে ইংরেজি পড়াতে হয়।

শান্ত ফোর্থ ইয়ারের হয়েও তার ডিসিপ্লিনে ফার্স্ট ইয়ারে ম্যাডামের কয়েকটি ক্লাস অলরেডি করে ফেলেছে। তার চলার পথে ইচ্ছে করে সামনে পড়ছে। তার রুমের সামনে অযথাই ঘোরাঘুরি চালিয়ে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য ম্যাডামের নজরে পড়া, তার সঙ্গে কথা বলা, ঘনিষ্ঠতা বাড়ানো। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই সুযোগ আসেনি। আজ আমরা তাকে এগিয়ে দিলাম সেই সুযোগের সম্ভাবনায়।

ম্যাডাম, এক্সকিউজ মি। আমি কি আপনাকে ছাতাটা দিয়ে সাহায্য করতে পারি। শান্ত অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ছাতাটা ম্যাডামের দিকে এগিয়ে ধরলো।

না, না কোনো সমস্যা নেই। হালকা বৃষ্টি আর একটু এগোলেই রিকশা পেয়ে যাবো।

ম্যাডাম, আপনি ভিজে যাচ্ছেন। সবাই দেখছে এবং হাসাহাসি করছে, কাইন্ডলি ছাতাটা নেন।

কিন্তু তুমি তো ভিজে যাবে। একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে ম্যাডাম ছাতাটা নিলেন।

ম্যাডামের এই ভুবন বিজয়ী হাসিটা অনেকের বুকের কাছে তীর হয়ে যায়। শান্ত লক্ষ্য করলো, ইতিমধ্যে ম্যাডামের হালকা নীল শাড়িটা ভিজে গেছে, লেপ্টে যাচ্ছে তার অতি অসমতল বুকে। শান্ত আর তাকাতে পারলো না সেদিকে।

খামাখা তোমাকে ভিজতে হবে না। তুমি আমার সঙ্গে এসো। ম্যাডামের কথায় আদেশের সুর।

শান্ত উপেক্ষা করতে পারলো না। তাকে আসতে হলো ছাতার নিচে। খুব ক্লোজ হয়ে হাটতে হচ্ছে দুজনকে। ম্যাডাম সাবলীল ভঙ্গিতে হেটে যাচ্ছেন আর টুকটাক কথা বলছেন। কিন্তু শান্ত পড়েছে দারুণ অস্বস্তিতে। মাঝে মাঝে ছোয়াছুয়ি হয়ে যাচ্ছে ম্যাডামের সঙ্গে, ভীষণ নরম এক পুতুলের সঙ্গে। তার হার্টবিট বেড়ে যাচ্ছে।

কি ব্যাপার তুমি এতো ছটফট করছো কেন?

ম্যাডাম, সরি, আমি আপনার সঙ্গে এক ছাতার নিচে যেতে পারবো না। আমি তো লাইব্রেরিতে যাবো। এই তো সামনেই। আমি পরে ছাতাটা নিয়ে নেবো।

কোনো রকম একটা অজুহাত তৈরি করে ছাতা থেকে নিজেকে বের করে আনলো সে। পা চালিয়ে দিল লাইব্রেরির দিকে।

সেদিন সারা রাত শান্তর ঘুম হলো না। আমরা তাকে বিভিন্ন কথায় আকাশে তুলে দিলাম। অবাস্তব সব সম্ভাবনা জুড়ে দিলাম তার চিন্তায়। দোস্ত, তিন বছরের সিনিয়রিটি কোনো ব্যাপার না। সাতার কাটতে পারলে সাগরে, নদীতে, পুকুরে সবখানেই কাটা যায়।

হলে প্রচারিত হয়ে গেল শান্ত ম্যাডামের সঙ্গে এক ছাতার নিচে এসেছে। কেউ কেউ তার হাতের যেখানাটাতে ম্যাডামের ছোয়া লেগেছে সেখানে আহ! দোস্ত, কতোদিন কোনো মেয়ের শরীরের গন্ধ নিই না। ছোয়া তো অনেক দূর। তোকে নিয়ে নাচতে ইচ্ছে করছে।

পরদিন আটটার মধ্যে শান্ত ক্যাম্পাসে চলে গেল। সরাসরি ম্যাডামের রুমে। ম্যাডাম তাকে ধন্যবাদ দিলেন। সৌজন্যতাবশত নাম, ডিসিপ্লিন, ইয়ার জানতে চাইলেন। এটুকুই। অথচ শান্ত গতকাল থেকে কতো কিছুই ভাবছে। ম্যাডাম তার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করবেন, বাসায় যেতে বলবেন ইত্যাদি। কিন্তু সে রকম ঘটলো না।

ম্যাডাম থেমে থাকলেও থেমে নেই আমরা। আরো থেমে নেই শান্তর অতি আবেগপ্রবণ মনটা। রঙিন স্বপ্ন দেখে চলেছে সে আর তার ভাবনায় খোরাক যুগিয়ে যাচ্ছি আমরা। ছাতা থেরাপির পর আমরা চলে গেলাম কার্ড থেরাপিতে। আমাদের কথামতো নববর্ষ, ঈদ, ভ্যালেন্টাইনস ডে পর্বগুলোতে শান্ত বেনামে কার্ড পাঠাতে শুরু করলো। তার ধারণা, ম্যাডাম বুঝে নেবেন। কিন্তু সুন্দরী এবং ভালো ছাত্রী

হওয়ায় ছোটবেলা থেকে ছেলেদের চিঠি, কার্ড, অযাচিত প্রেম– নিবেদন এগুলো দেখে দেখে ম্যাডাম নিজেকে অনেকটা আবেগ প্রতিরোধক করে ফেলেছেন। করিডোরে শান্তর সঙ্গে দেখা হয়। ম্যাডাম নির্বিকার। শান্ত ভাবে, কি নিষ্ঠুর মেয়েরে বাবা! নিজের অপরিবর্তনে অঙ্গীকারবদ্ধ।

শান্ত কিছুটা হতাশ। তার হতাশা দেখে আমাদের মধ্যে অতি উৎসাহী একজন ম্যাডামের হয়ে শান্তকে প্রেমের চিঠি লিখে ফেললো এবং তাকে আমরা বুঝাতে পারলাম যে, এটা ম্যাডামের লেখা।

প্রেমে পড়লে মানুষ নাকি বোকা হয়। প্রাইমারি বোকা। শান্ত হয়েছে সেকেন্ডারি বোকা। চিঠিতে ম্যাডামের বাসায় তাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে একটা নির্দিষ্ট দিনে।

চিঠি পেয়ে শান্ত আকাশে উড়ছে। কি পরে ম্যাডামের বাসায় যাবে। কি নিয়ে যাবে এসব ভেবে সে মহাব্যস্ত। লেখাপড়া গাছে উঠেছে।

অবস্থা বেগতিক দেখে আমরা একদিন সত্যি কথাটা জানালাম এবং বোঝলাম যে তুই একটা আকাশ কুসুম কল্পনা করছিস। ম্যাডাম কোনো দুঃখে একটা ছাত্রের সঙ্গে প্রেম করতে যাবেন। তাও আবার শায়লা ম্যাডাম যিনি হাত বাড়ালেই অনেক যোগ্য প্রতিষ্ঠিত ছেলে পাবেন। তুই এসব ছাড়।

এরপরেই ঘটতে থাকলো সেসব অভাবনীয় ব্যাপারগুলো। আমাদের প্রিয় শান্ত একদম চুপচাপ, অতি শান্ত হয়ে গেল। কারো সঙ্গে কথা বলে না, ঠিকমতো খায় না, কোনো কাজে মন নেই, প্রায় ক্লাস মিস করে, উদাস হয়ে বসে থাকে যেখানে সেখানে। অতি আগ্রহ নিরর্থক প্রমাণিত হলে মানুষ হয়তো এভাবেই ভেঙে পড়ে। শান্তর এই পরিবর্তনে আমরা বেশ ভয় পেয়ে গেলাম।

কয়েকজন মিলে হাজির হলাম ম্যাডামের বাসায়। ম্যাডামকে সব কিছু খুলে বললাম।

ম্যাডাম রীতিমতো বিস্মিত।

আচ্ছা পাগল ছেলে তো! এই লেভেলে এসে কেউ এমন করে নাকি? তার সঙ্গে আমার যা যা ঘটেছে সেগুলো খুবই স্বাভাবিক। সে এতো গভীরভাবে চিন্তা করেছে? আমি তো এর মধ্যে কোনো রোমান্টিকতা খুজে দেখিনি। দেখার কোনো কারণও নেই। তিনি আমাদেরকে আশ্বস্ত করলেন, তোমরা কোনো চিন্তা করো না, আমি সব ঠিক করে দেবো।

এক শনিবারে ম্যাডাম হলে এলেন। শান্তকে রিকশায় নিজের পাশে বসিয়ে বাসায় নিয়ে গেলেন। ম্যাডাম সেদিন শান্তকে কি বুঝিয়েছিলেন জানি না। তবে শান্ত এখন অনেকটা স্বাভাবিক। মাঝে মাঝে তাদেরকে লাইব্রেরি, কাফেতে গল্প করতে দেখা যায়।

ম্যাডাম কি শান্তকে সেই কমন ডায়ালগগুলোই সার্ভ করেন – *তোমার এখন নিজেকে তৈরি করার সময়। এখন কেন এসব বাজে বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবে? বড় হও, দেখবে, আমার থেকেও অনেক সুন্দরী বিদূষী মেয়ে পাবে।*

আর শান্ত হয়তো সুনীলের মতোই ভাবে, *আমি আর কতো বড় হবো ম্যাডাম? আমি কি ঘরের ছাদ ফুড়ে আকাশ ছোবো, তবেই কি আপনি আমাকে ভালোবাসার বেলাভূমিতে নিয়ে যাবেন?*

খুলনা ইউনিভার্সিটি থেকে

বাবা ও স্বামী

– – নাসরীন আফরোজ

এক.

আমার বাবা খুব ভুলো মনের মানুষ। প্রায়ই তিনি কলম আর ছাতা সঙ্গে নিতে ভুলে যান আবার যেখানে যান সেখানেই কলম অথবা ছাতা দুটোই ফেলে রেখে চলে আসেন। কখনো কখনো এগুলো ফেরত পাওয়া যায়। কখনো তা পাওয়া যায় না। ১৯৮৪ সাল। আমি যখন এইচএসসি–তে মানবিক বিভাগে ছেলে মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান পেলাম তখন আমার বাবার আনন্দ দেখে কে। আমার রেজাল্টের পেছনে মূল চালিকাশক্তি ছিলেন আমার বাবা। ছাতার মতোই সারাক্ষণ আগলে রেখে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে পড়া দেখিয়ে আমার মেধার স্বীকৃতি অর্জনে সহায়তা করেছেন তিনি। এ ১৯৮৪ সালেই ছাতা হাতে না থাকায় তিনি কি ধরনের কষ্টের মুখোমুখি হয়েছিলেন সেটা এখন লিখছি।

১৯৮৪ সালে তৎকালীন এরশাদ সরকার এসএসসি ও এইচএসসি–র মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য জাতীয় ছাত্র পরিষদের ব্যানারে চ্যান্সেলর পুরস্কার দেয়ার ব্যবস্থা করে। আমিও মনোনীত হলাম। নির্দিষ্ট দিনে বাবাসহ বঙ্গভবনের উদ্দেশ্য রওনা হলাম। তখন বাংলার শ্রাবণ মাস অর্থাৎ পুরো বর্ষাকাল ছিল। আমার বাবা তখন মানিকগঞ্জ সরকারি দেবেন্দ্র কলেজের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

মানিকগঞ্জ থেকে ঢাকাগামী বাসে যখন উঠি তখনো অল্প অল্প বৃষ্টি ছিল বলে বাবার হাতে ছাতা ছিল। বাসে উঠে ভেজা ছাতাটি ফোল্ড করে তিনি সিটের নিচে পায়ের কাছে রেখে দেন। ঢাকা পৌছার পর যথারীতি ছাতা নিতে তিনি ভুলে যান। আমারও মনে হয়নি ছাতার কথা। কারণ তখন বঙ্গভবনে

ঢোকার বিষয়ে দারুণ উত্তেজিত ছিলাম। এছাড়া চ্যান্সেলর পুরস্কার প্রাপ্তি নিয়েও খুব চিন্তা করছিলাম, কেমনভাবে সালাম দেবো, কেমনভাবে নেবো ইত্যাদি।

বঙ্গভবনের মূল গেটে আসার পর আগে ইসুকৃত পাস দেখে শুধু আমাকে ঢুকতে দেয়া হলো। বাবাকে গেটের কাছে দাড়ানো রেখে ভেতরে ঢুকলাম। যাওয়ার সময় বারবার পেছন ফিরে দেখছিলাম আমার বাবার গর্বিত হাসিমুখ। অনুষ্ঠান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় ঘণ্টা তিনেক বঙ্গভবনের ভেতরে ছিলাম আর আমার বাবা বাইরে গেটের কাছে দাড়ানো অন্যান্য সব অভিভাবকদের সঙ্গে। যখন সব শেষ হলো তখন বের হয়ে দেখি ইতিমধ্যে তুমুল বৃষ্টি হয়ে গেছে।

বঙ্গভবনের সুদৃশ্য বাগানে বিভিন্ন গাছের পাতায় বৃষ্টির পানি সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে। গেটের কাছে পৌছে দেখি আমার বাবা পুরো ভেজা শার্টপ্যান্ট পরে সেই একইভাবে দাড়িয়ে আছেন। মাথার চুলগুলো সব ভেজা। অন্যান্য সব অভিভাবকদের কাছে ছাতা ছিল। ছিল না শুধু আমার বাবার কাছে। গেটের কাছে দাড়ানো গার্ড তাকে একটু গার্ডের ছাউনির ভেতরে ঢুকতে দেয়নি এই তুমুল বৃষ্টির মধ্যেও। ছাতাবিহীন সম্পূর্ণ ভেজা বাবাকে দেখে আমার যে কি কষ্ট হচ্ছিল তা বলার না। শুধু মনে হচ্ছিল আমি এতোক্ষণ কি আনন্দে সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলরুমে আরামে বসেছিলাম। আর আমার বাবা কেমন করে এই বৃষ্টিতে ভিজেছেন। আমার খুব কান্না পাচ্ছিল। সব কিছুর জন্য নিজেকে দায়ী করছিলাম। মনে হচ্ছিল বাস থেকে নামার সময় যদি আমি খেয়াল করতাম তাহলে আজ বাবাকে আমার জন্য এভাবে ভিজতে হতো না।

সে বছর অমনভাবে ভিজে বাবার খুব ঠাণ্ডা লেগেছিল। অনেক দিন ভুগতে হয়েছিল তাকে। আমি এখনো বিষয়টি ভুলতে পারি না। নিজেকে স্বার্থপর আর অপরাধী মনে হয়।

দুই.

আমার নানি সব সময় বলতেন, স্বামী হচ্ছে মেয়েদের ছাতার মতো। স্বামীর কাজ হলো সব রকম বিপদ–আপদ থেকে অর্থাৎ ঝড়–বৃষ্টি–রোদ থেকে মেয়েদের আগলে রাখা। এ কথা শুনে কুমারী আমি খুব হাসতাম আর ঝগড়া করতাম তার সঙ্গে এই বলে যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হচ্ছে মূল ছাতা যা নারী–পুরুষ সবাইকে বাচায়। আমি তখন ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। খুব জোরালো যুক্তি দিয়ে তাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্বরূপ বোঝানোর চেষ্টা করতাম।

তিনি মানতে চাইতেন না। আমার যুক্তিতে হেরে গিয়ে বলতেন, যতো যাই বলো স্বামী অবশ্যই মেয়েদের ছাতা।

আমার অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ স্বামী তিন মাসের জন্য অফিসের কাজে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। দুই শিশু সন্তান, নিজের চাকরি, সংসার সব সামলাতে গিয়ে একা বেশ হিমশিম খাচ্ছি। এখন আমি জানি না, কেন স্বামী রূপ ছাতার খুব প্রয়োজন অনুভব করছি। মনে হচ্ছে সে থাকলে অমুক সমস্যাটি সে দেখতো বা সে এই দায়িত্বটি নিজে নিয়ে নিতো এসব। আমি একজন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নারী। অফিসের যে কোনো সমস্যা সুচারু রূপে সমাধান করার যোগ্যতা আমার আছে। এরপরেও আমার স্বামীর অনুপস্থিতি হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছি বললে ভুল হবে না। বাচ্চাদের বিভিন্ন বিষয় থেকে শুরু করে সংসারের খুটিনাটি নানান সমস্যায় তার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারছি। আমার নানির কথা আজ আমার কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে।

আমার স্বামী সত্যিকার অর্থেই আমার কাছে ছাতার মতো। আমি জানি, যদি এ লেখাটি ছাপা হয় তাহলে আমার লেখার অনেক সমালোচনা হবে। এরপরও আমি বলবো যে, সংসারে নারীর পাশাপাশি পুরুষের বিরাট ভূমিকা অনস্বীকার্য আজকের এই আধুনিক যুগেও। আর এ ভূমিকা অনেকটা ছাতার মতোই। আমার স্বশিক্ষিত নানির কথা আমি আজ অনুধাবন করছি ভীষণভাবে।

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ থেকে

বিয়ে

= = স্বপন

আমি তখন আড়াইসিধা স্কুলের শিক্ষক ছিলাম। পাশের গ্রামেই আমার এক ছাত্রীর বাবা মেয়ের বিয়েতে আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। আমি তারিখ মতো বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিলাম। যথাসময়ে বরযাত্রী এলো। ধুমধামের সঙ্গে আপ্যায়ন পর্ব শেষ হলো। কাজি বিয়ে পড়ালেন।

বিয়ে বাড়িতে আনন্দ উৎসবের কমতি ছিল না। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা মেয়েকে সৎপাত্রে কন্যাদান করে খুব খুশি মনে চারদিকে খোজখবর নিতে লাগলেন। আমার কাছেও একবার এসে খোজখবর নিয়ে গেলেন। এখন কন্যা বিদায়ের পালা। তখনই ঘটলো একটি ঘটনা। অন্দর মহলের ভেতর বেশ জোরে কথা কাটাকাটির আওয়াজ শুনতে পেলাম।

ছেলের বড় ভাই এবং দুলাভাই বলতে লাগলেন, আমরা এই মেয়ে ঘরে তুলবো না। এই চলো, আমরা চলে যাই।

সঙ্গে সঙ্গে বরও ব্যাঙের মতো লাফিয়ে উঠলো, হ্যা, চলো, এখানে আর এক মুহূর্তও নয়।

হঠাৎ বিয়ে বাড়িতে কান্নাকাটি ও চিৎকারসহ শোকের ছায়া নেমে এলো।

ছেলের অভিভাবকদের পা পর্যন্ত ধরতে লাগলেন মেয়ের বাবা। আমরা সবাই শত অনুরোধ করা সত্ত্বেও এরা কোনো কথাই শুনবে না। তাদের একটাই কথা, বিয়ের মধ্যে ছাতা দেয়ার কথা ছিল। ছাতা না দিলে এক্ষুণি চলে যাবেন।

এদিকে বর চিৎকার করে বলতে লাগলো, এরা ছোটলোক আর মিথ্যুক। কথা দিয়ে কথা রাখেনি। আমরা এখনি চলে যাবো।

মেয়ের বাবা তো এই পরিস্থিতিতে একেবারে বোবা হয়ে গেলেন। কি থেকে কি হয়ে গেল বুঝে উঠতে পারছেন না।

আমি রাগে অপমানে ঠিক থাকতে পারছিলাম না। জোরে ধমক দিয়ে বরের দুলাভাইকে বলে উঠলাম, কি পেয়েছেন আপনারা? এটা কি মগের মুল্লুক নাকি? সামান্য একটা ছাতার জন্য আপনারা এই কাণ্ড করছেন। এটা বিয়ে বাড়ি, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এখানে আছেন। এদেরও মানসম্মান আছে। আপনারা বসেন, ছাতা আমি দেবো। তবু মেয়ে না নিয়ে এই বাড়ি থেকে এক পাও নড়তে পারবেন না।

সবাই আমার কথায় স্তব্ধ হয়ে গেল। কাছেই বাজার থেকে ছাতা এনে তারপর কন্যা বিদায় করা হলো। পরে মেয়ের বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরে কেদে ফেলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে

প্রথম প্রকাশ

= = এমআর আলী

আমাদের বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব দেড় কিলোমিটার আর আমার ক্লাসমেট রুনুর বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার প্রায়। আমার বাড়ি থেকে স্কুলে যেতে হলে রুনুর বাড়ির সামনে দিয়েই যেতে হয়। আমি, রুনু এবং অন্য দুই বন্ধু মিজান, দুলাল প্রাইভেট পড়ি প্রতিদিন স্কুল ছুটির পর।

এটা যেদিনের ঘটনা সেদিন ছিল বৃষ্টির দিন। মনে হয় শ্রাবণ মাসের কোনো একদিন হবে। বৃষ্টির কারণে স্কুল ছুটি হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। আমরা চারজন প্রাইভেট শেষ করে বাড়ি ফিরবো। মিজান এবং দুলাল চলে গেল। আমি আর রুনু দাড়িয়ে রইলাম। কারণ আমার কাছে ছাতা নেই। রুনুর কাছে আছে।

রুনু কিছুক্ষণ ভেবে বললো, চলো, এক সঙ্গেই যাই।

বৃষ্টির কথা চিন্তা করে রাজি হয়ে গেলাম।

দুজনেই জুতা ব্যাগের ভেতর ভরে নিলাম। প্যান্টের নিচের অংশ ভাজ করে গোটালাম। রুনুও তাই করলো।

মূল রাস্তায় যখন এসে পড়লাম তখন শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। কোথায়ও কোনো জনমানবের চিহ্ন নেই। একই ছাতার নিচে দুইজন মানুষ। কোনো সাড়া নেই কারো মুখে। ছাতাটি অবশ্য আমিই বয়ে চলেছিলাম।

কিছুক্ষণ চলার পর রুনু আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে বলে ইশ, তোর পা কি সুন্দর!

আমি একটু রসালো করে বললাম, তোর পা আরো সুন্দর।

হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো তাই? আমার আর কি সুন্দর?

বললাম, তোর নাক, মুখ, চোখ, ঠোট এবং বুক সবই সুন্দর।

আমাকে হালকা ধাক্কা দিয়ে বললো, খুব দুষ্ট হয়ে গেছিস। মেয়ে মানুষের বুকের দিকে তাকাস? না?

বললাম, মেয়েমানুষের বুকে তাকাবো কেন শুধু শুধু।

আমাদের পাশ দিয়ে একজন বয়স্ক লোক হেটে গেছে। আমাদের দিকে কেমন বাকা চোখে তাকালো, কিছু না বলেই চলে গেল। বৃষ্টির ঝাপটায় দুজনেই সামান্য ভিজে গেছি। শরীরের সঙ্গে শরীর লেগে আছে। রুনুর শরীরে কেমন উত্তপ্ত ভাব। তার শরীর থেকে কেমন যেন একটা উগ্র গন্ধ বের হচ্ছে যা নেশা নেশা ভাব এনে দেয়।

কাচা রাস্তা, পা সামলিয়ে চলছি। কিন্তু রুনু করছে তার উল্টো। কারণে অকারণে আমার গায়ে হেলে পড়েছে। এক হাতে ছাতা অন্য হাত দিয়ে ব্যাগ সামলাতে হয় বলে দুহাতই আমার বন্ধ।

রুনুর এক হাত ফ্রি, মাঝে মাঝেই সে বলে চলছে তোর ভাগে ছাতা বেশি। তাই সে আরো জড়ো হচ্ছে। কখনো বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে বলে কাধের ওপর দিয়ে ঘাড় পর্যন্ত ধরার চেষ্টা করছে।

আমরা গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলছি মাথার ওপর ছাতা নিয়ে। আমার সঙ্গে সে কাদা ছিটিয়ে দুষ্টামি করছে। আমিও একটু একটু চেষ্টা করছি।

হঠাৎ সে শান্ত হয়ে বললো, দেখতো আমার গায়ে জ্বর আসছে মনে হয়।

কই, দেখি তোর জ্বর। বলে কপালে হাত দিলাম। বললাম, না, জ্বর নেই।

সে বললো, দুর বোকা, জ্বর দেখতে হয় বুকে।

আমার হাতটা নিয়ে তার বুকে রেখে বললো, দেখ, জ্বর আছে কি না?

আমি হাত সরিয়ে নিলাম। কিছুই বললাম না। দুজনে আরো কতোক্ষণ নীরবে পথ চললাম। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সে এক পর্যায়ে কাদার ওপর পড়ে যাচ্ছি বলে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। তার

উত্তপ্ত বুক আমার বুকের সঙ্গে মিশে আছে, নিশ্বাস দ্রুত। এই অবস্থায় তার চোখের দিকে তাকলাম। মুখে প্রশান্তির হাসি।

আমি বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছি। কারণ ছাতা সরে গেছে মাথার ওপর থেকে। দুজনেই ঠিক হয়ে হাটতে লাগলাম।

রুনু আমার কানের কাছে মুখ লাগিয়ে বললো, কেমন লাগলো রে?

এমন করছিস কেন বলতো? মানুষে দেখলে কি বলবে এই বলে নিজেকে একটু গম্ভীর করলাম।

বললো, তোকে একটু আদর করি?

আমি তাকালাম না।

হঠাৎ তার রঙিন ঠোট আমার গাল স্পর্শ করলো। নিজে নিজেই ভেজা ওড়না দিয়ে আবার মুছে দিল এবং বলতে লাগলো ছেলেদের এতো কঠিন হতে নেই। আরো ফ্র হতে হয়। আমি যে তোকে ভালোবাসি তা কি তুই বুঝিস?

বললাম, না।

সে বললো, আমি বুঝি, তুই যে আমাকে ভালোবাসিস।

ইতিমধ্যে আমরা রুনুদের বাড়ির কাছে চলে এসেছি। তাকে বাড়িতে পৌছে দিয়ে রুনুর ছাতা নিয়ে চলে এলাম আমার বাড়িতে। মনে মনে ছাতাটাকে ধন্যবাদ দিলাম যার কারণে রুনুর মুখে একটা সত্যি কথা শুনতে পেলাম। আমি বলার আগেই যা সে অনুভবে বুঝে নিল।

আজ প্রায় এগারো বছর হলো, তাকে আমি ভালোবাসি। সে বেচে থাকলে হয়তো ভালোবাসতো। ছাতার কারণেই প্রথম প্রকাশ পায় আমার ভালোবাসা।

চোদ্দগ্রাম, কুমিল্লা থেকে

ম্যাডাম

= = ফারজানা

আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি তখন ইংলিশ-এ একজন স্পেশাল ম্যাডাম পেয়েছিলাম। ক্লাসের ৩৫টা মেয়ের মধ্যে ২৮জন মেয়েই তার কাছে পড়তো। ফলে তার বাসায়ই সব পড়িয়ে দিতেন, ক্লাসে এসে শুধু গল্প করতেন। ক্লাসের আমরা যারা তার কাছে পড়তাম না ম্যাডাম তাদের খুবই হেনস্তা করতেন। ক্লাসে এসে তিনি শুধুই গল্প করতেন।

তার স্বামী তাকে ম্যারেজ ডে–তে কি কিনে দিলেন। সেদিন শপিংয়ে গিয়ে কতো টাকা খরচ হলো। তার ছেলে বাসায় কি কি দুষ্টুমি করে, তার বর তাকে নতুন কি কি ফার্নিচার কিনে দিল এসব নানান গল্প করতেন। কিছুই তো পড়াতেন না আবার বলতেন এবার এই স্কুল থেকে এসএসসি–তে কয়টা মেয়ে ফেল করবে। এটা বলে তিনি আকার–ইঙ্গিতে আমাদেরকেই বোঝাতেন। কেউ বিশ্বাস করবে না যে, ক্লাসের অধিকাংশ মেয়েই তার বাসায় শুধু ইংলিশই পড়তো কতো টাকা দিয়ে। আমি পড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু বড় ভাইয়া বললেন, কেন স্কুলের ম্যাডামের কাছে পড়বে। বাসায় স্যারের কাছ থেকেই বুঝে নিও। তাই আর পড়া হয়নি।

স্যার খুব সুন্দর করে গুছিয়ে ফার্স্ট পেপারের প্রশ্নের উত্তর লিখে দিতেন। কিন্তু এগুলোতে ম্যাডাম নাম্বারই দিতেন না। ম্যাডামের প্রশ্নের উত্তর লিখে আমার বান্ধবী তিন চার পেতো অথচ আমাকে এক অথবা দেড় দেয়া হতো। ফলে আমি করতাম ফেল। তারা করতো পাস। একবার ম্যাডামের কাছে গিয়েছিলাম জানার জন্য আমার উত্তরে কি ভুল যে, আমি এতো কম নাম্বার পেলাম।

ম্যাডাম বললেন, তোমার উত্তর কিছুই হয়নি।

একদিন তো ম্যাডাম আমাদের সাতজনের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন এবার এই কয়টা মেয়ে এই স্কুল থেকে ফেল করে আবার ফিরে আসবে। সেদিন মনটা এতো খারাপ হয়েছিল যে, বাসায় এসে বাথরুমে বসে অনেকক্ষণ কেদেঁছিলাম।

সেই ম্যাডামই বর্ষায় একদিন ছাতা নিয়ে স্কুলে আসেননি। আমার ছাতাটা যাওয়ার সময় বৃষ্টিতে ভিজেছিল বলে খুলে পেছনে রেখে দিয়েছিলাম। ক্লাস শেষে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। ম্যাডাম আমার ছাতাটা নিয়ে বললেন, এটা কার ছাতা, আমি নিয়ে যাচ্ছি। বৃষ্টি কমলে আমাদের রুমে গিয়ে নিয়ে এসো।

তখন আমার মেজাজটা এতো খারাপ হচ্ছিল যে কি বলবো। মনে হচ্ছিল কেন আমি ছাতা নিয়ে এসেছিলাম!

যখন এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্টের পর মার্কশিট আনতে স্কুলে গেছি তখন দেখলাম রচনামূলক প্রশ্নের উত্তরে আমার সেই বান্ধবী পেয়েছে ২৮ এবং আমি পেয়েছি ৩৫ নাম্বার। তখন আমার এতো আনন্দ হচ্ছিল তা বোঝাতে পারবো না। এটা আমার জীবনের অনেক বড় পাওয়ার একটি পাওয়া। ম্যাডামকে আমি আমার মার্কশিট দেখাতে পারিনি। কিন্তু এটি আমার জীবনের একটি অনেক বড় পুরস্কার এবং আমি ফেলও করিনি।

কাঠালবাগান, ঢাকা থেকে

কঠোর বাস্তব

== মোহাম্মদ আকবর হোসেন

ক্লাস সিক্স থেকে সেভেনে উঠলাম তৃতীয় হয়ে। রোদ-বৃষ্টিতে পুড়ে-ভিজে তিন মাইল হেটে স্কুলে যেতাম। বিশেষত বর্ষাকালে বৃষ্টি আর কাদায় শরীরের অবর্ণনীয় অবস্থা হতো। ভোগান্তি হতো আরো বেশি। তালপাতার বিশেষ যন্ত্রটি (স্থানীয় গ্রাম্য ভাষায় *পেকে*) ছাত্রছাত্রীদের হাসির উদ্রেক ঘটাতো। সার্বিক অবস্থা উপলব্ধি করে মিয়াভাই বললেন, ক্লাসে ফার্স্ট হতে পারলে ছাতা পাবে। হার্ট অ্যান্ড সোল চেষ্টা করলাম। পরিশ্রম ব্যর্থ হলো না। তিন থেকে এক অর্থাৎ ক্লাস এইটে ফার্স্ট হলাম। কথা রাখলেন বড়ভাই। চোরাই পথে ইনডিয়া থেকে একটা লেডিস ছাতা আনিয়ে দিলেন। ছাতা পেয়ে সে কি আনন্দ, সে কি খুশি। খুব কম ছাত্রছাত্রীর সেই রকম ক্যাটেগরির ছাতা ছিল। গর্বিত আমি।

একদিন স্কুল থেকে বন্ধুর সাইকেলে বসে বাড়ি ফিরছি। ছাতাটি হ্যানডলে বাধা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেটি চাকার ভেতর ঢুকে গেল, কটকট করে সাইকেলের সাত আটটি স্পোক কাটলো, ছাতার বাটটি হলো দ্বিখণ্ডিত। বাড়িতে এসে ভয়ে ভয়ে ছাতাটিকে গুছিয়ে একটা নির্দিষ্ট স্থানে এমনভাবে রাখলাম যেন কেউ বুঝতে না পারে এটার সর্বনাশ হয়েছে। আগে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ছাতা ব্যবহার করি, এখন অতি প্রয়োজনেও ছাতার ধারেকাছে যাই না।

একদিন কি যেন প্রয়োজনে আব্বা ছাতাটি চাইলেন, আমি এড়িয়ে গেলাম, অন্যত্র সরে পড়লাম। বাড়ি ফিরে দুপুরে খেতে বসেছি এমন সময় আব্বা-ভাই এবং সুযোগ মতো অন্যান্যরা আবশ্যক অনাবশ্যক বকাবকি করলেন। মনটা খুব খারাপ হলো। পরে দেখলাম ছাতার ভাঙা বাটকে কাঠের টুকরা দিয়ে দুই খণ্ডের মধ্যে সংযোগ সাধন করে আব্বা সেটাকে ব্যবহার উপযোগী করে তুলেছেন।

নয় ভাইবোনের মধ্যে আমি চতুর্থ। বাবা একা উপার্জনশীল ছিলেন। সংসারে খুব অভাব ছিল। সন্ধ্যাবেলা পড়তে বসেছি আব্বা হাট থেকে ফিরে আমার পাশে বসে একটা পেয়ারা বের করে চুপিচুপি দিয়ে মৃদু হাসলেন। দুপুরে ছাতা নিয়ে বকাবকি শুনে মনটা খারাপ ছিল, একটা পেয়ারা দিয়ে তিনি মনটা ভালো করে দিলেন। তখন এমন পেয়ারার প্রাচুর্য ছিল না। অন্য অঞ্চল থেকে আমাদের এলাকায় আমদানি হতো। দামও ছিল বেশ। গরিব বাবার পরিবারে সকলের জন্য তার কেনার সামর্থ ছিল না। তাই মাঝে মধ্যে আমার আব্বা এমনিভাবে আদর যত্ন করতেন।

আব্বা লেখাপড়া জানতেন না। কিন্তু লেখা পড়ার কদর বুঝতেন। তাই তার উৎসাহ, আদর-যত্ন, কষ্ট যাতে বৃথা না যায় সে বিষয়ে সজাগ ছিলাম। তিনি ছিলেন আমার জীবনে ছাতার মতো। সেই ছাতার আশ্রয়ে জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ভুলে, প্রচণ্ড ঝড়, বৃষ্টি, রোদ তথা প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা

করতে পেরেছি। আজ আমি সমাজে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। একটা বেসরকারি কলেজের শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত।

ছাতা নিয়ে আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে। তখন চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। সেখানে তুলনামূলক বৃষ্টি বেশি হয়। একটা ছাতা না হলে নয়। ছাতার স্থায়ীত্বের কথা চিন্তা করে আধুনিক প্রচলিত ছাতা না কিনে বড় ধরনের ব্যক্তিক্রমধর্মী ওল্ড মডেলের ছাতা কিনলাম। ক্যাম্পাসে ব্যবহার করতে হয়। অনেক বন্ধুবান্ধব ঠাট্টা–মশকারা করে।

একদিনের ঘটনা এক বান্ধবী কথা প্রসঙ্গে আমাকে বললো, তোমার ছাতার মতো তোমার মনটাও বড়। এখানে আমাকে একটু ঠাই দেবে?

এর আগেও ধনীর দুলালি এই সুন্দরী বান্ধবী আমাকে ভালোবাসার প্রস্তাব দিয়েছে। গরিবের ছেলে আমি, বাস্তবের কঠিন কঠোরতার কথা চিন্তা করে তার প্রস্তাব এড়িয়ে গেছি। সেদিন তার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, গভীর কাকুতি–মিনতি। আমি ভীতু কাপুরুষ, তাকে প্রত্যাখান করেছিলাম।

এই তো কয়েকদিন আগে স্ত্রী–পুত্র নিয়ে ঢাকায় শপিং করছি। সেই বান্ধবীর সঙ্গে দেখা। জানলাম তার ভালো ঘর–বর হয়েছে। সাক্ষাতের শেষ পর্যায়ে আমার স্ত্রী স্বাতীকে বললো, তুমি তার ছাতার তলে আশ্রয় পেয়েছো। তুমি সৌভাগ্যবান।

গিন্নি জানতে চাইলো, তোমার বান্ধবী কি যেন ছাতার কথা বললো, সেটা আবার কি? আমি মৃদু হেসে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু ভাবলাম ঠিক হবে না, ঘটনার একটু টাচ দিতে সে হেসে ফেললো।

ঘটনাটি এর আগে তার শোনা ছিল।

সাতক্ষীরা থেকে

পুলক

== সমীর সরকার

১৯৯৭ সালের ঘটনা। আমি সে বছর এসএসসি পরীক্ষার্থী। বিজ্ঞানের ছাত্রদের স্কুলে কোচিং অবশ্যই করতে হবে, হেড স্যারের নির্দেশ। তাই প্রতিদিন আড়াই কিলোমিটার পথ হেটে স্কুলে আসতে হতো। রোদ, বৃষ্টি থেকে বাচার জন্য আমার একমাত্র সঙ্গী ছিল ছাতা যা কি না স্কুলে আসার সময় মা হাতে ধরিয়ে দিতেন। গ্রামীণ রাস্তা বলে রিকশা কম চলতো।

পুলক।

আনন্দমোহন কলেজ

ময়মনসিংহ থেকে

সংগ্রাম

== এমআই হোসাইন

বাবা ছাতা সেলাইকারী হওয়ায় তার আয় দিনে ত্রিশ চল্লিশ টাকার বেশি হতো না। ছাতা সেলাই, ছেড়া ছাতা তালি দেয়ার কাজে তাকে যেতে হতো গ্রাম হতে গ্রামান্তরে। রোগা, দুর্বল ও বৃদ্ধ হওয়ায় তিনি বেশি পরিশ্রম করতে পারতেন না। তার স্বল্প আয়ে বাবা, মা আমি তিন সদস্যের আমাদের পরিবার। চলে যেতো কোনো রকমে।

সিক্স, সেভেন করতে করতে ক্লাস টেনে পড়লাম। এলো ফরম পূরণের সময়। ফরম পূরণ করতে ৭৫০ টাকা লাগবে শুনে বাবা দুশ্চিন্তায় পড়লেন। বেড়ে গেল তার পরিশ্রম। ভোর হতেই বেরিয়ে পড়তেন ছাতা সেলাইয়ের কাজে। চলে যেতেন অনেক দূরের গ্রামে, হাটে, বাজারে। যোগাযোগের সুব্যবস্থা না থাকায় তাকে পায়ে হেটেই পথ চলতে হতো। দিন দিন তার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে দেখে খুব খারাপ লাগতো। কিন্তু করার কিছুই ছিল না।

একদিন বাবা গেলেন আমাদের বাড়ি থেকে আট মাইল দূরের একটি হাটে ছাতা সেলাইয়ের কাজে। সেদিন রাতে অনেক ঝড় বৃষ্টি হলো। রাতে বাড়ি না ফেরায় আমি, মা দুশ্চিন্তায় পড়লাম। পরের দিন দুপুরে কয়েকজন লোক ধরাধরি করে একটি মৃতদেহ আমাদের উঠানে রাখলেন। এটি আমার বাবার মৃতদেহ।

রাতে বাড়ি ফেরার পথে ঝড়ের কবলে পড়ে কাদায় মুখ থুবড়ে পরে তিনি মারা গেছেন। ফরম পূরণের টাকা যোগাড় না হতেই বাবা মারা গেলেন। যে কয়টা টাকা যোগাড় হয়েছিল তা দিয়ে তার দাফনের ব্যবস্থা করা হলো। হলো না আমার ফরম পূরণ, দেয়া হলো না পরীক্ষা।

ক্ষিধে মিটানোর জন্য মায়ের অনুরোধে সম্বল করে নিতে হলো বাবার ব্যবসা। শুরু হলো পড়ালেখাহীন নতুন জীবন। ছাতা সেলাইয়ের পাশাপাশি উপকরণাদি কিনে দুই একটি ছাতা তৈরি করে বিক্রি করতাম। আয়ও কিছুটা বাড়লো। এভাবে কাটলো দুই বছর। ইতিমধ্যে গ্রামে হাট বসলো সপ্তাহে দুইদিন সোম ও বুধবার।

একটা ছাতার দোকান করলাম। একটা দুধের গাভী কিনলাম। পাশাপাশি কয়েকটা ছেলেমেয়েকে পড়াতাম। মা এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার কথা বললেন। ছাত্র খুব একটা ভালো ছিলাম না। তাছাড়া

মাঝে দুই বছরের গ্যাপ। তাই পরীক্ষার কথা শুনে গা শিউরে উঠলো। মায়ের কথায় রাজি হয়ে আবার পড়ালেখা শুরু করলাম। ফরম পূরণ করলাম। পরীক্ষা দিয়ে ভালোভাবেই এসএসসি পাস করে পাশের গ্রামের কলেজে ভর্তি হলাম। ইন্টারমিডিয়েট পাস করলাম স্টার মার্কস নিয়ে। পাশাপাশি ছাতার ব্যবসাটাও ভালোই চলছিল। বাবা মায়ের আশির্বাদে আজ আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। এখনো আমার ছাতার দোকান আছে। তবে মা এরই মধ্যে বাবার কাছে চলে গেছেন। আমার মামা এখন দোকান চালান। আমাকে টাকা পাঠায় প্রতি মাসে।

বাবা মা না থাকলেও আমার দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের সঙ্গী হিসেবে আমার ছাতার দোকানটাই আছে। যখন কোনো ছাতা সেলাইওয়ালাকে দেখি তখন মনে পড়ে অতীত স্মৃতি। যখন বৃষ্টি হয় তখন হলের জানালার পাশে আনমনে বসে থাকি। বৃষ্টি দেখি, বাবার মৃতদেহ দেখি, নিঃসঙ্গ জীবনের কথা ভাবি। অজান্তেই চোখ বেয়ে নেমে আসে নোনাজলের স্রোত। মায়ের ভালোবাসা পাবার আশায় জবাই করা পশুর মতো ছটফট করে মন। এরই মাঝে বয়ে চলছে আমার জীবন। মাঝে মাঝে একা একা বলি,

লাগবে গো ছাতা সেলাই

নতুন, পুরান ছাতা-আ-আ-আ।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে

গর্ব

== মাসুদা খান

এই স্যাটেলাইটের যুগে বিশ্বাস করাও হয়তো শক্ত যে, একটি ছাতা দেখার জন্য পথচারীরা আমাদের থামাতো।

১৯৭৮ সাল। আজ থেকে ২৩ বছর আগের কথা। আমার বাবা জেলা শহরের একজন নামকরা চক্ষু বিশেষজ্ঞ ছিলেন। আমরা সাত ভাইবোন। আমাদের বাসায় কাজের লোক ছিল তিনজন। প্রায় প্রতিদিন দুই তিনজন অতিথি খাওয়া-দাওয়া করতেন। আমরা সব ভাইবোন লেখাপড়া করতাম স্কুল ও কলেজে। সংসারে এতো খরচের পরে হয়তো সবাইকে স্কুল, কলেজে যাতায়াতের জন্য আমার বাবার পক্ষে রিকশা ভাড়া দেয়া সম্ভব ছিল না। তাই আমাদের ছোট দুই বোনকে আব্বা একটা ছাতা কিনে দিয়েছিলেন।

একদিনের কথা। আব্বা ঢাকা গিয়েছিলেন কাজে। ঢাকা থেকে ফিরে আমাদের দুই বোনকে কাছে ডাকলেন। আমরা মনে মনে একটু উত্তেজিত। নিশ্চয়ই কোনো উপহার এনেছেন তিনি। আমাদের

অবাক করে দিয়ে তিনি দুটো ছাতা বের করলেন। এই উপহারের কথা আমরা ভাবতেই পারিনি। অনিন্দ সুন্দর সেই রঙিন ছাতা পেয়ে আমরা দারুণ খুশি। তখন এই জেলা শহরে এ রকম পৃন্টের রঙিন ছাতার দেখা পাওয়া যেতো খুম কম। কারো বিদেশ ফেরত আত্মীয়স্বজন হয়তো আনতেন। যা হোক, এই রকম রঙিন ছাতা পেয়ে আমরা আনন্দিত। স্কুলে হেটে যাতায়াত করতাম আমরা। রোদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমরা ছাতা নিয়ে স্কুলে যেতাম। আর একেকদিন একেকজন আমাদের দাড় করিয়ে ছাতা দেখতো। অনেক পথচারী দাড়িয়ে উৎসুক হয়ে আমাদের ছাতার দিকে তাকিয়ে থাকতো। একদিন এক বয়স্ক ভদ্রলোক আমাদের দাড় করিয়ে খুব নেড়েচেড়ে ছাতা দেখছিলেন। এবং কোথা থেকে কিনেছি, কতো দাম কেমন করে খুলতে হয়, বন্ধ করতে হয় ইত্যাদি জেনে নিচ্ছিলেন। আমরা খুব গর্ব করে উত্তর দিচ্ছিলাম।

আমরা যে এ রকম দর্শনীয় ছাতার মালিক এই ব্যাপারটা তখন আমাদের খুব গর্বের ছিল। এ কথা আজ খুব মনে পড়ে। আজ এই ২০০১ সালে যখন আমার বাচ্চা কোনো কিছু উপহার পেলে খুব বেশি অবাক হয় না বা খুশি হয় না, ভাবে এটা তাদের প্রাপ্য। তখন খুব বেশি করে সেদিনের ছাতা উপহার পাবার কথা মনে পড়ে যায়।

দিনাজপুর থেকে

দুর্নীতির চ্যাম্পিয়ন দেশে

== মোহাম্মদ ফোরকান ওয়াহিদ

কুমিল্লা শহরে এসেছি বেশ কয়েক মাস। কিন্তু এখনো শহরটাকে ঠিকভাবে দেখা হয়ে ওঠেনি নানান কাজের চাপে। সেদিন সন্ধ্যায় ভাবলাম শহরটা একটু ঘুরে দেখবো। বের হতেই বৃষ্টি অগত্যা ছাতাই ভরসা। বের হওয়ার কিছুক্ষণ পরই বৃষ্টি শেষ। বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাফেরার পর রিকশা চেপে ফিরে আসি বাসায়।

বাসায় আসার কিছুক্ষণ পরই বুঝতে পারি ছাতা নেই। বৃষ্টি শেষ হওয়ার পর ছাতার কথা আর মনে ছিল না। খুবই শখের ছাতাটি। গতবার কক্সবাজার বেড়াতে গিয়ে কিনেছিলাম। নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছিল। ছাতার শোক কাটানোর জন্য টিভি ছেড়ে বসলাম ড্রইং রুমে।

বেশ কিছুক্ষণ পর কলিং বেলের শব্দ। দরজা খুলে দেখি একজন মধ্যবয়সী লোক দাড়িয়ে। হাতে আমার হারিয়ে যাওয়া ছাতাটি। বললেন, স্যার, আপনার ছাতা। ভুল করে রিকশায় রেখে

দিয়েছিলেন। আমি কিছুদূর যাওয়ার পর রিকশার সিটে ছাতাটি দেখি। তাই আপনাকে ফিরিয়ে দিতে এলাম।

যতোটা না ছাতা ফিরে পাওয়ার আনন্দে তার চেয়ে অনেক বেশি অভিভূত হলাম একজন গরিব রিকশাচালকের সততা দেখে। যেখানে ছাতাটি সে বেমালুম গায়েব করে দিতে পারতো তা না করে উল্টো কষ্ট করে ফিরিয়ে দিতে এলো আমার কাছে। দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত একটি দেশে এ রকম একজন সৎমানুষের দেখা পাওয়া সত্যি বিরল। নিজেকে সৌভাগ্যবান ভাবলাম এ রকম একজনের দেখা পেয়ে।

কুমিল্লা থেকে

গুরু

== সরোজিত কুমার দাশ

ক্লাস নাইনে উঠে সায়েন্সে ভর্তি হলাম। তিন মাস পর যখন অংক উচ্চতর গণিত ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় হলো তখন থেকে আমার এই দোষ ধরা পড়ছে। প্রথমে সাক্ষাৎ হলো এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম, এই জগৎ সংসার আমার জন্য নয়, বিবাগী হয়ে চলে যাবো। ধ্যান করবো হিমালয়ের গুহায়। বাবার হাতের উত্তম মাধ্যম খেয়ে সে বছরের মতো সন্ন্যাসী হওয়ার মতো নেশা আমার কেটে যায়।

এরপর পরিচয় হয় এক বিখ্যাত ছাতাওয়ালার সঙ্গে। সন্ন্যাসী সঙ্গে বিচ্ছেদ এবং ছাতাওয়ালার সঙ্গে পরিচয়ের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ালেখায় বেশ উন্নতি করলাম। ছাতাওয়ালার সঙ্গে আমার পরিচয় বর্ষার শেষ সময়ে। তার গুণে মুগ্ধ হলাম। আমি তখন তার ভাব শিষ্য বলা যায়। আমাদের স্কুলের পাশেই তিনি থাকতেন। সারাদিন বাইরে বাইরে কাজ করতেন। সন্ধ্যায় ফিরতেন। রাতেও তিনি বসে বসে কাজ করতেন। তিনি শুধু ছাতা মেরামত নয়, কবিরাজি এবং দোয়া-তাবিজ দিতেন।

এ রকম একজন গুরু বহুদিন ধরে সন্ধান করছিলাম। বয়সে অনেক বড়। তাই বলতেও লজ্জা করে। তার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গল্প করতাম। তিনি আবার অন্য কোনো কথা বিশ্বাস করেন না। রেডিও টেলিভিশন নাকি মিথ্যা। তার কথায় সম্মতি প্রকাশ করি। ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে সঙ্গে তার আরো কয়েকজন সাগরেদ জুটে গেল। আমি ছিলাম তার প্রধান শিষ্য।

একদিন লজ্জার মাথা খেয়ে বললাম, চাচা, আপনার তাবিজের তো অনেক গুণ। মিতার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তৈরি করে দেন। আপনি যা চান আমি তাই দেবো।

কথা শুনে আমার দিকে চাচা মিনিটখানেক তাকিয়ে থাকলেন।

বললেন, আগামীকাল সন্ধ্যায় এসো দেখি কি করা যায়।

যাওয়ার সময় মনে হলো, চাচার পায়ের ধুলো নিই। মিতার জন্য আমি তখন পাগল। কোথায় বিজ্ঞান, কোথায় অংক। আমার এক ধ্যান এক জ্ঞান, মিতা।

আমাকে মিতা ভালোবাসে না। আমিও ছাড়ার পাত্র না। *একবার না পারিলে দেখো শতবার* এই নীতিতে আমি বিশ্বাসী। রাত আর শেষ হয় না। চাচা পরদিন আমাকে দেখা করতে বলেছেন। বিকেলে বাড়ি এসে বইগুলো কোনো প্রকার রেখে মায়ের জমানো ডিম থেকে চারটি ডিম নিয়ে চাচার কাছে গেলাম। চাচা ডিমগুলো পেয়ে খুব খুশি হলেন। এই হলো আমার গুরু-দক্ষিণা।

চাচা, এবার আমার কি দেবেন দেন, আমি অনুনয়ের স্বরে বললাম।

চাচা পরের দিন দুইটা বড় নারকেল, এক বোতল ঘাটি সরিষার তেল এবং একশ টাকা নিয়ে আসতে বললো।

নারকেল আর তেল না হয় চুরি করতে পারবো। কিন্তু একশ টাকা কোথায় পাবো। সারা রাত চিন্তা করলাম। সকালে উঠে মায়ের চোখ পড়লো আমার দিকে। আমার চোখ লাল। মা বললেন কি হয়েছে,

বললাম, সারা রাত বই পড়েছি।

আমার কথা শুনে মা মহাখুশি। স্কুল থেকে এসে বড় দুইটি নারকেল ও এক বোতল সরিষার তেল নিলাম। সরিষার তেল নিতে গিয়ে ঘরে অনেকটা ফেলে দিলাম। সামান্যর জন্য মায়ের দৃষ্টি থেকে বেচে গেলাম। একশ টাকা ছোট কাকার পকেট থেকে চুরি করলাম। আজ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করবো। মিতা, আমাকে ভালোবাসবে।

অবশেষে এগিয়ে এলো সেই সময়। আমার শ্রদ্ধেয় *ছাতাচাচা* তার গুরুবিদ্যা প্রয়োগ করলেন। সামান্য ছোট একটি শিশিতে সরিষার তেল দিলেন। ভোর বেলায় যে জবা ফুল ফুটবে সেই জবা ফুলে সরিষার তেল ছিটিয়ে ঘুমন্ত মিতার গায়ে ছিটিয়ে দিতে হবে।

চেষ্টা করলে, হিমালয়ের শিখর জয় বা অলিম্পিকে সোনা জেতা সম্ভব। কিন্তু ঘুমন্ত মিতার গায়ে ভোরের ফোটা জবা ফুল দিয়ে সরিষার তেল ছিটানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

একে বর্ষার শেষ তার উপর ঘোর অন্ধকার। বুক বেধে নামলাম। ভালোবাসার জন্য জীবন উৎসর্গ করে দেবো। রাতে ভাত খেতে গিয়ে মা প্রথম থেকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ভাবলাম না। এসব সামান্য ব্যাপারে মাথা ঘামানো যাবে না। রাত দুইটার দিকে বেরিয়ে পড়লাম। তখনো জবা

ফুল ফোটেনি। আবার ফিরে এলাম। চারটার দিকে গিয়ে ফুল তুলে দুর্গম পথ অতিক্রম করে মিতার ঘরের জানালার পাশে গিয়ে দাড়ালাম। ভাগ্য সহায়, জানালা খোলা ছিল। তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে।

মিতার দাদা কখন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে এসেছে তা বুঝতে পারিনি। জানালার পাশেই আমাকে ধরে ফেললেন। বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলেন। আমার হাতে ছাতাচাচার মহৌষধ। অবশেষে স্বীকার করলাম মারের দাপটে। ছোটকাকা গিয়ে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। তার টাকার কথাও স্বীকার করলাম। নিজ রুমে তিন চার দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ড। এরপর যখন বিছানা ছেড়ে পাড়ায় এলাম তখন আমার গুরু ছাতাওয়ালার আর দেখা পাইনি।

সাতক্ষীরা থেকে

বোধ

== মামুন বাবু

সকাল ৮টার *সাকুরা পরিবহনে* টিকেট কাটা। জরুরি ভিত্তিতে ঢাকা আসতে হবে। সাতটা বেজে গেছে। এখনই রওনা দিতে হবে। কারণ প্রায় দুই কিলোমিটার পায়ে হাটার পথ এবং ২৫ মিনিট রিকশার পথ পাড়ি দিয়ে গৌরনদী বাসস্ট্যান্ড আসতে হবে। এর জন্য তাড়াহুড়া করে বাড়ি থেকে বের হলাম। কিছুক্ষণ হাটার পর লক্ষ্য করলাম, ক্রমেই চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি নামবে এ রকম অবস্থা। সমূহ বিপদের আশঙ্কায় কেপে উঠলাম। প্রথমত আমার কাছে কোনো ছাতা নেই। দ্বিতীয়ত. আশপাশে কোনো বাড়ি-ঘর নেই। চারদিক শুধু ফসলের ভূমি আর ভূমি। মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। দ্রুত পা চালালাম। কিছুক্ষণের মধ্যে ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়া শুরু করেছে। ক্রমেই বর্ষার গতি বাড়ছে।

আমার সামনে বেশ খানিকটা দূরত্বে ষাটোর্ধ এক ভদ্রলোককে হেটে আসতে দেখছিলাম। যখন বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম তখন থেকেই লক্ষ্য করলাম বৃষ্টি পড়া শুরু হতেই তিনি একটা ছাতা বের করে মাথার উপর ধরে হাটছেন। তবে মজার ব্যাপার হলো, যতোই বৃষ্টির গতি বাড়ছে ততোই তার হাটার গতি কমছে। এর সঙ্গে তিনি বার বার পেছনের দিকে তাকাচ্ছেন।

আমি দ্রুত হেটে তাকে অতিক্রম করার মুহূর্তে তিনি কোনো কথা না বলে তার ছাতাটা আমার মাথার উপর ধরলেন। আমি তো ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক।

তার দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে যাবো এর আগেই তিনি বললেন, তুমি ভিজে যাবে আর আমি ছাতা মাথায় দিয়ে যাবো তা কি হয়। তারচেয়ে এসো দুজনে এক সঙ্গে যাই।

তার কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মনে মনে আল্লাহকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালাম এই সমূহ বিপদ থেকে খানিকটা হলেও রক্ষা করার জন্য। ছাতাটা আমার হাতে নিয়ে দুজনে হাটতে লাগলাম।

পরিচয় সূত্রে জানলাম, তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। আমাদের গ্রামে বেড়াতে এসেছিলেন। বিভিন্ন কথার মাঝে এক সময় উভয়েই আধা ভেজা হয়ে পাকা রাস্তায় উঠি। তিনি তার গন্তব্যে চলে যান। আমি রিকশা নিয়ে স্টেশনের দিকে চলে যাই।

গাড়িতে বসে ভাবতে লাগলাম কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। ভাবতে লাগলাম এই বখে যাওয়া সমাজে এখনো কিছু ভালো মানুষ আছেন যারা মানুষের উপকারের জন্য সদাপ্রস্তুত। এদের সংখ্যা কতো? আমাকে নিজের কাছে খুব ছোট মনে হয়। কারণ যখন আমি ভদ্রলোককে অতিক্রম করছি তখন একটা সালাম দেয়ার চিন্তাও করলাম না। অথচ তার কাছ থেকে পেলাম প্রয়োজনের মুহূর্তে মস্ত বড় এক উপকার।

গাড়ি শা শা করে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। তবে মাথার ভেতর শুধু তার একটা কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে। ভদ্রলোক বলেছিলেন, তোমাদের যদি সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে যেতে না পারি তাহলে তোমাদের কাছ থেকে কিভাবে পরবর্তী প্রজন্ম শিক্ষা পাবে?

ঢাকা থেকে

যক্ষের ধন

== মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক

নীতু আমার এক বছরের সিনিয়র। দেখতে সুন্দরী। এক কথায় অপূর্ব। হাটা-চলায় সব সময় একটা গাম্ভীর্য এবং অহঙ্কারী ভাব থাকায় কখনো কাছে ভেড়ার সাহস পেতাম না। কলেজে যাওয়া-আসার পথে মাঝে মাঝে চোখাচোখি হতো তবে কথা হয়নি কখনো।

নতুন কলেজে ভর্তি হয়েছি। বড়ভাই এবং গার্ডিয়ানদের নানান রকম উপদেশ আর নীতি বাক্য শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হওয়ার দশা। তাদের সামনে বাড়িতে যতোক্ষণ থাকি ভদ্রতা প্রদর্শনে কোনো রকম কার্পণ্য না করলেও কলেজে গিয়ে নানান রকম বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে বাদরামির চরম সীমানায় পৌছে যাই।

স্কুল জীবনে নানান রকম বন্দী অবস্থা থাকলেও কলেজে এসে সীমাহীন স্বাধীনতা পেয়ে অল্প সময়ে সেরা বাদর হিসেবে বেশ নাম করে ফেলি বন্ধুদের মাঝে। মেয়েদের টয়লেটে গোপনে চিকা মারা থেকে শুরু করে বসার বেঞ্চে বিষগুড়া ছিটিয়ে রেখে বাদরামির বহিঃপ্রকাশ করা ছিল প্রায় নিত্যদিনের কাজ। এ কারণে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের কটু কথাও চোখ বুজে হজম করতে হতো।

এমনি একদিন কলেজ ছুটির কিছুক্ষণ আগে সেই যে বৃষ্টি শুরু হলো আর থামার নাম নেই। বসতে বসতে অধৈর্য হয়ে শেষ পর্যন্ত বন্ধু সোহেলের ছাতাটা টান মেরে কেড়ে নিয়ে একেবারে নিজের ছাতা বানিয়ে খাতাপত্র সব তার কাছে রেখে *বাদর নাচা* নাচতে নাচতে স্বার্থপরের মতো কলেজ এরিয়া পার হয়ে আসি।

বৃষ্টির কারণে প্যান্টটার নিচের দিকের কিছু অংশ ভাজ করে হেড়ে গলায় শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিনের গাওয়া বাংলা সিনেমার একটা গান নিজ মনে প্যারোডি করে চলেছি আগামীকাল কলেজে বন্ধুদের শোনাবো বলে। এ সময় প্যারোডিতে মন থাকায় আশপাশের কোনো কিছুই খেয়াল ছিল না। হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা দোকানের সামনে বৃষ্টি থেকে বাচার জন্য নীতু একেবারে জড়সড়ো হয়ে দাড়িয়ে আছে। নীতুর মতো অনেকে এসে এ সময় দোকানে ভিড় করেছে। এতোগুলো লোকজনের উপস্থিতিতে নীতু একেবারে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে অসহায়ভাবে দাড়িয়ে বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় ছিল।

নীতুকে এই অবস্থায় দেখে এবং তার অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরে কিছুটা দ্বিধা নিয়ে কাছে এগিয়ে যাই আমি। নিজেই উপযাচক হয়ে ঠোটে কিছুটা হাসির রেখা টেনে ছাতাটা নীতুর দিকে এগিয়ে ধরি। উদ্দেশ্য, সাময়িকভাবে ছাতাটা দিয়ে নীতুকে অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করা। কিন্তু নীতুর কারণে সেটা আর সম্ভব হয়নি।

ছাতাটা নীতুর দিকে এগিয়ে ধরতেই কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই নীতু এক লাফে সোজা চলে আসে আমার ছাতার নিচে। এ ঘটনায় কিছুক্ষণের জন্য হতবাক হয়ে যাই। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বুঝতে পারি, দোকানে দাড়ানোর চেয়ে আমার ছাতার নিচে থাকাটা প্রেফার করছে সে। এরপর ছাতা নিয়ে না বের হওয়ার কারণে নিজেকে বার বার ধিক্কার দিতে থাকে নীতু।

আমি অবশ্য রীতিমতো ভদ্রছেলের অভিনয় করে তখনো ছাতাটা নীতুর কাছে ছেড়ে দিয়ে সোহেলের কাছে মাপ চেয়ে নেয়ার প্ল্যান আটছি মনে মনে। কিন্তু সেটাও সম্ভব হয়নি শেষ পর্যন্ত। তার কথা, ছাতাহীনভাবে আমাকে ফেলে যাওয়া নাকি স্বার্থপর ও অবিবেচকের মতো কাজ হবে। কাজেই আমিও কোনো কথা না বাড়িয়ে ছাতার নিচে মাথা রেখে শরীরের এক–তৃতীয়াংশ বৃষ্টির জন্য বরাদ্দ করে নীতুর

সঙ্গে ধীরপায়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি। এভাবে চলতে গিয়ে নীতুর শরীরের স্পর্শে বার বার শিউরে উঠি। কিছুদূর আসার পর বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় নীতু ধন্যবাদ জানিয়ে ছাতাসহ বিদায় দেয় আমাকে।

পরের দিন কলেজে গিয়ে সোহেলের কাছে চুপি চুপি তার ছাতার কেরামতির কাহিনী জাহির করতেই আর যায় কোথায়! দোস্ত হয়ে গেছেরে, হয়ে গেছে, বলে সাত আটজনের *বাদর* বাহিনী আমার শরীরের নানান অংশ ধরে টানতে টানতে সোবহান মিয়ার হোটেলে নিয়ে আমার পকেটের বারোটা বাজিয়ে ছাড়ে।

এরপর থেকে নীতুর সঙ্গে কথা বলার বাতিক বেড়ে যায়। নীতুও দেখি বেশ পাত্তা দিতে শুরু করেছে আমাকে। ফলে যা হওয়ার তাই-ই হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে বেশ সখ্যতা গড়ে ওঠে আমাদের দুইজনের মাঝে। দুজন দুজনের আরো কাছাকাছি চলে আসি আমরা। গত জুনের প্রথম সপ্তাহে আমাদের প্রেমের সাড়ে তিন বছর পূর্ণ হলো।

মাঝে মাঝে নীতুকে মজা করে বলি, তোমার মতো এমন সুন্দরী, স্মার্ট একটা মেয়ে শেষ পর্যন্ত আমার মতো একটা *বাদরের* ঘাড়ে ঠাই পেল?

জবাবে নীতু তার ভুবন ভোলানো হাসি ছড়িয়ে একের পর এক যেভাবে আমার গুণকীর্তন শুরু করে তাতে বলিউডের শাহরুখ, সালমান, আমির খান ও বর্তমানের ক্রেজ ঋত্বিক-কে বড় অসহায় বলে মনে হয়। এবং আমি জগতের শ্রেষ্ঠ সুখী মানুষের পেছনে ফেলে সামনের সারিতে স্থাপন করি নিজেকে।

ইতিমধ্যে দুই পরিবার থেকে জেনে গেছে আমাদের গোপন প্রেমের কথা। নীতুর বাবা প্রথমদিকে এ ব্যাপারে ক্ষীণ আপত্তি করলেও নীতুর একগুয়েমির কারণে কোনো যুক্তিই শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকেনি। এখন পারিবারিকভাবে আমাদের বিয়ের ব্যাপারে অগ্রসর হচ্ছে উভয় পরিবার।

সোহেলের ছাতার মাধ্যমে আমাদের সম্পর্কের সূত্রপাত হয় বলে সোহেল তার সেই ছাতাটা পরবর্তী সময়ে আমাকে উপহার হিসেবে দিয়েছে। আমিও যক্ষের ধন-এর মতো করে সেই ছাতাটা আগলে রেখেছি। ইচ্ছা আছে ছাতাটা আমি বাসর ঘরে নীতুকে দেখিয়ে অবাক করে দেবো। এখন সুন্দর একটা মুহূর্তের জন্য চাতক পাখির মতো আমি ও নীতু প্রহর গুণছি।

মনিরামপুর, যশোর থেকে

উপহার

== মোল্লা আবদুর রহিম

লবণের বাজার একেবারে মন্দা। ভারতীয় চোরাই লবণের দাপটে আমাদের উৎপাদনও বিক্রি প্রায় বন্ধ। এ অবস্থা কাটিয়ে উঠতে হবে। তাই আমরা বিজ্ঞাপনমুখী হলাম। ঘোষণা করলাম বিশেষ উপহার ছাতা।

প্যাকেটে লাকি কুপন আর ২৫ কার্টনে একটি ছাতা। *পদ্মা লবণ*–এর মনোগ্রামে বাহারি রঙ–এর সুবৃহৎ ছাতা যে কারোরই নজর কাড়বে। আমাদের পিকআপে মাইকিং, রেডিও এবং সিডিতে প্রচারে বিক্রি দিন দিন বেড়ে চললো। পদ্মায় পুরনো আমেজ ফিরে এলো।

মাস খানেক পরের ঘটনা। পিকআপ নিয়ে মার্কেট থেকে ফিরে এলো সেলসম্যান। হাউমাউ করে কেদে জানালো সে আর লবণ বিক্রি করতে যাবে না।

কারা যেন বোমা মেরে গাড়ি থামিয়ে উপহারের ছাতা নিয়ে চলে গেছে। গাড়ির সঙ্গে সেলসম্যানও ক্ষত–বিক্ষত। এমন ভয় সে পেল যে, কোনো প্রকার সান্ত্বনা কিংবা নিরাপত্তার আশ্বাসেও হামলাকারীদের নাম জানালো না। দর্শনীয় ছাতাই আমাদের বিপদ ডেকে আনতে লাগলো।

অফিসে প্রতিদিন লোকজন আসছে ছাতার জন্য। তাদের অনেকেরই লবণ নয়, ছাতা চাই এবং দিতে হবে। না দিয়েও উপায় নেই। শপাচেক ছাতার ঘাটতি নিয়ে এভাবে আমার মজুদ শেষ হলো।

নতুন অর্ডারের ছাতা এখনো হাতে আসেনি। প্রকৃত উপহার প্রাপ্যদের দিচ্ছি–দেবো করে কালক্ষেপণ করতে হচ্ছে। কিন্তু তাতে প্রকৃত আর অপ্রকৃত পাওনাদার মিলে পরিস্থিতি তালগোল পাকিয়ে গেল। বেসামাল অবস্থা দেখে আমাকে গা ঢাকা দিতে হলো। চিফ একসিকিউটিভ হিসেবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য আমাকে নোটিশ করা হলো। আত্মপক্ষ সমর্থনের দিন ধার্য হলো। আমার কৈফিয়তের পালা। কিন্তু না, সবাইকে অবাক করে কৈফিয়ত দিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিন্টু চৌধুরী। আমাদের পণ্যের বাজার ধ্বংসকারী আর সীমান্ত রক্ষায় ব্যর্থদের যথার্থ দোষারোপ করে আমাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিলেন। কম্পানির স্বার্থে সকল প্রকার বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হলো।

ইতিমধ্যে অর্ডারের ছাতা হাতে আসে। সেগুলো প্রকৃত প্রাপ্যদের দেয়ার নির্দেশ দেন। বান্ডিলের ভেতর থেকে বের করে একটি ছাতা আমাকে উপহার দেন তিনি। আমার কাছে দেখে সেই সব ফাও–এর দল আবার যদি লাইন লাগায় সেই ভয়ে ১৯৯৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সেই ছাতাটি ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। উপহারের এই ছাতাটি কখনো ব্যবহার করতে পারবো কি না জানি না।

খুলনা থেকে

গৌরী আন্টি

== আবু সুফিয়ান কানন

বর্ষা আমার কখনোই পছন্দের ঋতু ছিল না। বর্ষাকালে চারদিকে কর্দমাক্ত হয় বলেই বোধহয় বর্ষা আমার পছন্দ হয় না। বিশেষত হাটার সময় প্যান্টে কাদা ছিটকে পড়ে। এই ব্যাপারটা আমার একেবারেই ভালো লাগে না। অথচ ঘোর বর্ষারই একদিনে গৌরী আন্টির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

১৯৯৬ সালের শেষের দিকের কথা। কলকাতায় পাওয়া বন্ধু জুয়েল আর সুজনের সঙ্গে এদের ট্রাভেলার্স চেক ভাঙাতে ব্যাংকে গেছি। গৌরী আন্টির সঙ্গে চোখাচোখি সেখানেই। কথার শুরুটাই আমার সঙ্গে হঠাৎ তিনি বলে বসলেন, আপনারা কি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন?

অপরিচিত মহিলার এমন প্রশ্নে স্বাভাবিকভাবেই অপ্রস্তুত হলাম আমরা। এরপরও নিজেদের সামলে নিয়ে বললাম, কেন বলুন তো?

তিনি আমাদের পরিস্থিতি টের পেয়ে বললেন, কিছু মনে করবেন না। আমি ঠিক কিছু ভেবে প্রশ্নটা করিনি। আসলে আমার শেকড়টা বাংলাদেশের। আমার বাবা-মা, স্বামী-সন্তান আমরা সকলেই পুরোপুরি বাংলাদেশি। ঘটনাচক্রে ভারতের নাগরিক হলেও মনটা পড়ে থাকে সেই বাংলার মাটিতেই। আপনাদের কথাবার্তা আর কাপড়-চোপড়ে বাংলাদেশি মনে হলো। এখানকার কাউকে দেখলেই আমার খুব কাছের লোক মনে হয়। ভীষণ আপন মনে হয়।

আমাদের সকলের মন সহসাই ভীষণ রকমের দ্রবীভূত হলো। এরই মাঝে আমার সঙ্গে ওনার বেশ ভাব হয়ে গেল। কথায় কথায় জানলাম তিনি এ ব্যাংকেই কাজ করেন। আমরা কে কোথায় থাকি, কোথায় পড়াশোনা করছি ইত্যাদি খবরাখবর নিলেন। ওনার বাসার ঠিকানা দিয়ে সময় করে যেতে বললেন।

চেক বদল করার পর ওনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় যাবার উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছি হঠাৎই ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি শুরু হলো। ভিজতে ইচ্ছা করছিল না। এদিকে ছাতাও নেই। কি করবো ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। হঠাৎই দেবদূতের মতো সাহায্যের হাত বাড়ালেন গৌরী আন্টি। পিয়নের হাতে নিজের একটি এবং ওনার কলিগের কাছ থেকে ধার নিয়ে আরো একটি ছাতা দিয়ে বললেন, যাও, দাদাদের বাস স্টপেজে পৌছে দিয়ে এসো। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের চোখেমুখে কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠলো।

মাস দুয়েক পরের কথা। বাগুইহাটি কলেজের বন্ধু সৌমেনের বাড়ি বেড়াতে গেছি। মনে হলো সেদিনের সেই ভদ্রমহিলা তো কাছাকাছিই থাকেন। ওনার সঙ্গে দেখা করে এলে বোধহয় খুব একটা

মন্দ হয় না। অন্তত সেদিনের সাহায্যের জন্য ওনাকে ধন্যবাদটা দিয়ে আসা দরকার। এছাড়া সেদিন ছিল রবিবার। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ওনাকে পাবার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো যখন গিয়ে দেখলাম তিনি বাড়ি নেই। কোনো একটা কাজে বাইরে গেছেন।

এদিকে পরিচয় দেয়ার পর তো ওনার বাবা-মা এবং মেয়েরা তো আমাকে ছাড়বেই না। জানালেন, আমাদের কথা ওনারা গৌরী আন্টির কাছে শুনেছেন। ওনারা দেশের কথা জানতে চাইলেন। দাদু, দিদা (গৌরী আন্টির বাবা-মা) প্রগাঢ় মমতায় আমাকে জড়িয়ে রাখলেন। বললেন, জানো তো ভাই, ভিটেমাটির টান যেন এক অদৃশ্য নাড়ির টান। তোমাদের দেখে যে আমাদের কি ভালো লাগছে সেটা তোমরা কোনোদিনও জানবে না। এরই মাঝে গৌরী আন্টি এবং আঙ্কল এলেন। শুরুতেই অধিকার নিয়ে বলে বসলেন, কি ব্যাপার, তোমাদের তো আরো আগে আসার কথা ছিল।

ওনার বলার মাঝে কিছু একটা ছিল যা আমাদের চোখ ছল ছল করে দিল। মনে হলো, এমন সুরে তো আমার এবং আমাদের বাবা মায়েরাই কথা বলে থাকেন। রক্তের সম্পর্ক ছাড়াও যে মানুষের মাঝে একটা অদ্ভুত সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে তা বুঝলাম ওনাদের দেখে। এরপর প্রায়ই ওনাদের বাসায় যাওয়া হতো। দাদু, দিদা, পূজা, মিমি, আঙ্কল এবং গৌরী আন্টির সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দেয়া হতো। সুন্দর একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে আমাদের এবং অবশ্যই এর প্রধান কৃতিত্বের অধিকারী গৌরী আন্টিই।

পড়াশোনা শেষে কলকাতার পাট চুকিয়ে দেশে ফিরে আসবো এমন সময়ের কথা। বলে রাখা দরকার, আমরা যারা দেশের বাইরে পড়াশোনা করেছি তাদের সকলকেই ফরেন রেজিস্ট্রেশন অফিসে নাম এন্ট্রি করাতে হয়। দেশে ফেরার সময় এবং তাদের এখানে ল্যান্ড করার সময় ফরেন রেজিস্ট্রেশন অফিসে ইনফর্ম করতে হয়। বিশেষত দেশে ফেরার সময় অনেক ক্ষেত্রে তারাই একটা নির্দিষ্ট দিন বেধে দেয় এবং অবশ্যই শিক্ষার্থীর মতামত নিয়ে। বিদায় নিতে কারোরই ভালো লাগে না, আমারও না। ভেবে রেখেছি ঠিক ফেরার আগের দিন সন্ধ্যায় জুয়েল আর সুজনসহ গৌরী আন্টির সঙ্গে দেখা করে আসবো। কাপড়-চোপড় পরে রেডি হয়ে বাইরে পা বাড়িয়েছি হঠাৎই ভয়াবহ রকমের বৃষ্টি শুরু হলো। ভীষণ মন খারাপ হলো আমাদের। কারণ ছাতা ছাড়া এই বৃষ্টিতে সামনের দিকে এগোনো একেবারেই অসম্ভব। এদিকে ফরেন রেজিস্ট্রেশন অফিসের নিয়ম অনুযায়ী পরদিনই আমাকে কলকাতা ছেড়ে যেতে হবে।

ছাতার জন্যই এমন এক স্বর্গীয় মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আবার সেই ছাতার জন্যই ওনার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হলো না। দুটো ঘটনাই নিঃসন্দেহে কাকতলীয় এটা ঠিক। সেই সঙ্গে এও

ঠিক, গৌরী আন্টির মতো মহিলাদের কথা উপন্যাসেই বেশি পাওয়া যায়। বাস্তবে খুব একটা মেলে না। তিনি এবং ওনারা যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন। সর্বশক্তিমানের শুভছায়া সব সময় ওনাদের ওপর থাকুক এটা আমার অন্তরের কামনা।

বনানী, ঢাকা থেকে

দুর্ভোগ

== সাগরিকা

সাগর, আজ আর কলেজে গিয়ে কাজ নেই। সেই ভোর থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। নাশতা করতে করতে মায়ের মুখে কথাটা শুনে বুকের ভেতরে ধুক ধুক করতে লাগলো। এখনই একরাশ মিথ্যা বলতে হবে। আজ না গেলে চলবে না। ইমপরটেন্ট ক্লাস আছে। তোমার মেয়ের জন্য তো আর টিচাররা ক্লাস বন্ধ করবে না।

চরম একটা মিথ্যা বললাম। আজ আমরা চার বান্ধবী কলেজেই যাবো না। সকালটা এদিক সেদিক করে দুপুরে চায়নিজ খাবো। তিন দিন আগে থেকে প্ল্যান করা। বৃষ্টির জন্য তো এমন একটা প্রোগ্রাম নষ্ট করা যায় না।

মা বললেন, তাহলে ছাতাটা নিয়ে যাও।

ছা–তা? অসম্ভব। রাস্তায় ছাতা নিয়ে বের হতে প্রেস্টিজে লাগে। বকবক করতে করতে বের হলাম বাসা থেকে। মরণের বৃষ্টি আর আসার সময় হলো না। ইশ! না জানি তারা কতোক্ষণ দাড়িয়ে আছে। ততোক্ষণে বৃষ্টি একটু কমেছে।

সারা দিন ঘুরে দুপুরে ঢুকলাম চায়নিজে। জয়া, শিপ্রা, স্মৃতি আর আমি। দুপুরে খেয়ে–টেয়ে যখন বের হলাম তখন আকাশে একটু একটু মেঘ। পাত্তা দিলাম না। চারজন এক রিকশাতে উঠলাম। ওমা! কিছুদূর যাবার পর ফোটা ফোটা বৃষ্টি। ভাবলাম এই ফোটা ফোটা বৃষ্টিতে কিছু হবে না। কিন্তু কিছু সময় পরই শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি।

রিকশাচালককে বললাম, ভাই, আপনার পর্দাটা দিন। রিকশার পর্দাকে মাথার ওপর দিলাম। আর যা হোক মাথায় বৃষ্টি লেগে ঠাণ্ডা না লাগলেই হলো। কিন্তু বিধি বাম। বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসের দাপটে রিকশার ওপরে বসা স্মৃতি এবং আমার হাত থেকে পর্দা গেল উড়ে। উড়ে পড়বি তো পড় একেবারে ড্রেনে।

এমনিতে বৃষ্টি তার উপর রিকশাচালকের পর্দা ড্রেনে, সব মিলিয়ে একাকার। একেবারে কাকভেজা হলাম চারজন। হাতে ফাইলে রাখা বই-খাতাও ভিজেছে। বৃষ্টিকে পাত্তা দিলাম না। যা হবার হবে। ভিজে ভিজে কোনো রকম বাসাতে গেলাম। না জানি কপালে আরো কি আছে।

দাদা বললেন, কলেজে না গিয়ে কোথায় গিয়েছিলি?

দাদা, তুই একটু বেশি বুঝিস। কোথায় যাবো আবার?

দাদা বললেন, বৃষ্টি দেখে মা আমাকে রিকশা নিয়ে কলেজে পাঠিয়েছিলেন। তুই আজ কলেজে যাসনি। ভেতরে যা, বুঝবি আজ।

ইশ! আজ ছাতাটা নিয়ে গেলে এ বিপদে পড়তাম না। যা থাকে কপালে। মায়ের সামনে যেতেই ঠাস করে একটু চড় পড়লো আমার মুখে। এরপর আরো যা হলো সেটা নাই-বা বললাম। বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর তো হলোই এবং তারপর থেকে কলেজে যাবার জন্য রিকশা ঠিক করে দেয়া হলো। কলেজ থেকে যেন আর পালাতে না পারি।

খুলনা থেকে